লৌকিক অলৌকিক

অমিতাভ চৌধুরী

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ : ১৩৭১

প্রকাশক :
প্রসন্ন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক :
সি. বি. এইচ. প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

LOUKIK ALOUKIK
By : Amitava Chowdhury

এই আমি

আজকের এই আমি আব কালকের সেই আমিতে অনেক তফাৎ। দেশ বিদেশের নানা জায়গায় ধাক্কা খাওয়া, নানা জনের সঙ্গে টক্কর দেওয়া এই লৌকিক আমি পিছন ফিরে যখন তাকাই, মনে হয় শৈশবের সেই আমি যেন গত জন্মের, যেন তখনকার সবই অলৌকিক। ইউরোপ-আমেরিকায় নানা মজার ঘটনা এবং হালের আমাকে নিয়ে লেখা কিছু রচনা দিয়েই এই বইটির প্রথম অংশ—এই আমি।

—অ. চৌ.

প্রশ্ন শুনে অবাক। আশ্চর্য ব্যাপার তো, ভদ্রমহিলা জ্যোতিষী জানেন নাকি? আমেরিকানরা আমাদের অনেকের হাঁড়ির খবর রাখে জানা ছিল, পেটের খবরও যে রাখে জানতুম না। ব্লুমিংটনের ইণ্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির কাফেটারিয়ায় সকাল বেলা ঢুকতেই কাউন্টারে টমেটোর মত লাল গোলগাল যিনি বসে আছেন, বর্ণ-বর্গের পঞ্চম অক্ষরগুলো অকাতরে উচ্চারণে ঢেলে জিগগেস করলেন—হাঁউ আঁর ইঁউ দিঁস মরনিং?

পেত্নি-শাঁকচুন্নির মত সানুনাসিক ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, ওটা মারকিনী ধরন, কিন্তু আমি যে কাল সারা রাত পেটের ব্যথায় চিঁ চিঁ করেছিলুম, এবং এখনও যে অকুস্থলে চিন চিন করছে, তার খবর ওই সাতজন্মের মাসিপিসি নয় ওই অপরিচিতাটি জানলেন কী করে?

এক্ষেত্রে জবাব কী দেওয়া উচিত ঠাহর করতে না পেরে দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করলুম। সহৃদয়া ভদ্রমহিলা আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে আমাকে ছেড়ে অন্য খদ্দেরে মন দিলেন।

ব্রেকফাস্ট সেরে জার্নালিজম বিভাগের বাড়ি আর্নি পাইন হলের দিকে যেতেই প্রফেসর ক্যালাওয়ের সঙ্গে দেখা। আবার অবাক। ক্যালাওয়ে তাঁর বত্রিশ পাটি দাঁত চিনির বস্তার মত খুলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—হাঁ-ই, হাঁউ আঁর ইউ দিঁস মঁনিং? এবারও কিছু জবাব দিলুম না। আগের মত কেঠো হাসি হেসে অন্য পথ ধরলুম। মনে মনে ভাবলুম, আমেরিকানদের ক্ষমতা আছে বটে, কোথায় ইনডিয়ার একটি ছেলে ইউনিয়ন বিলডিংয়ের চারশ' একুশ নম্বর ঘরে পেট ব্যথায় আগের রাত কাটাল, আর ভোর না হতেই জনে জনে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে!

আর্নি পাইল হলে আসতেই ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সবার মুখে সেই এক প্রশ্ন ; কেমন আছি আজ সকাল বেলা ? আচ্ছা, আমার পেছনে গোয়েন্দা-টোয়েন্দা লাগায়নি তো ? বলা যায় না ওদের এফ বি আই যা ধুরন্ধর প্রতিষ্ঠান এবং কম্পিউটার নামক যন্ত্রগণক এমন বুদ্ধিমান যে, হয়ত আমার ঘরের দেয়াল ফুঁড়ে পেটের খবর পাকড়াও করে নিয়েছে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। চেনা অচেনা যাঁর সঙ্গে দেখা হয়, সবাই সেই একই কথা পাড়ে। —হাঁউ আঁর ইঁউ দিঁস নুঁন ? এল বিকেল।—হাঁউ আঁর ইঁউ দিঁস আঁফটারনুন ? সন্ধ্যেবেলার প্রশ্ন—হাঁউ আঁর ইঁউ দিঁস ইঁভনিং ?

গোয়েন্দার ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চয়। নইলে সব শেয়ালের এক রা কেন ? নাকি প্রথম সম্ভাষণের এইটেই বোলচাল ? উঁহু, ইংল্যাণ্ড আর পশ্চিম ইউরোপের এন্তার জায়গা ঘুরেছি, সেখানে তো অন্য কেতা, কুশল বিনিময়ের শুরু অন্য রকম।

শেষমেষ আর পারলুম না, প্রফেসর ফারারের বাড়িতে ডিনারে মিসেস ফারার সেই অনিবার্য প্রশ্নটি জিগগেস করতেই ইংরেজি টেন্স, সিনটেক্স ইত্যাদি ঠিকঠাক করে সবিস্তারে নিবেদন করলুম—এখন ভাল আছি। কাল রাত্তিরে শরীরটা, মানে এই একটুকু, মানে যাকে বলে (ওরে বাবা, পেট ব্যাথার লাগসই ইংরেজি আবার না জানি কী) মানে পেটের ভিতর হ্যাঁচোড় পাঁচোড়, মানে—

মিসেস ফারার আঁকাভুরু কপালে তুলে দাঁত আর সিগারেটের ফাঁক দিয়ে সহানুভূতির মলম মাখানো মিহিসুর ছাড়েন—ওহ্ হোআট আ শেম।' তারপর চিৎকার পাড়েন—হানি হানি হানি—

আবার চিন্তায় পড়লুম। পেট ব্যথায় এরা মধু খাওয়ায় নকি ? হবেও বা, মার্কিন রীতিনীতিই দেখছি আলাদা।

না, ভদ্রমহিলার ডাকে কোন মধুর বোতল এল না, তার বদলে দোতলা থেকে তরতর নেমে এলেন মিস্টার ফারার। তাঁর হাতে, লক্ষ্য করলাম, কোন শিশি-বোতল নেই। ফারার সাহেব আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন—হাঁ-ই, হাঁউ আঁর ইঁউ দিঁস ইভনিং ?

অ্যাইরে সেরেছে। কিন্তু তকখুনি ফারার মেমসাহেব সোফার হাতায় একখানা হাত এলিয়ে দিয়ে স্বামীকে জানালেন, অতিথির শরীরটা ভাল নেই।

ফারার সব শুনে বললেন,—আঁর ইঁউ কিঁডিং হাঁনি?

গোটা ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকল। সাহেবও দেখছি মধুর কথা বলছেন। এদিকে মিস্টার ফারার অন্য ঘরে একলাফে গিয়ে আর এক লাফে ফের এসে সামনে দাঁড় করালেন হুইস্কির বোতল—কেনটাকি বুর্বণ। বললেন, একটু খাও, শরীর চাঙা হবে। এবারে বোঝা গেল, হুইস্কিকেই এরা তাহলে হানি অর্থাৎ মধু বলেন।

ঘোড়ার ডিম বুঝেছি। পরদিন আমার সুদীর্ঘকালের সুহৃদ, শান্তিনিকেতনী বেরাদর আশরাফ সিদ্দিকির সঙ্গে দেখা। সে পড়াশোনা করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন। বললে, তুই একটা আস্ত গাধা, ইডিয়ট কাঠবাঙাল। মার্কিন মুলুকে নতুন এসেছিস তো, তাই ওদের কথাবার্তায় অমন ভ্যাবা গঙ্গারাম বনছিস। গোড়ায় আমারও তাই হয়েছিল। 'হানি' মধু হতে যাবে কেন? ওটা হল গিয়ে আদরের ডাক। সম্বোধনের বুলি। কখনও 'হানি,' কখনও 'শুগার'।

নিকুচি করেছে তোর হানি আর শুগার। বললুম, কী জানি ভাই ইংরেজি সিনেমা কম দেখি, মার্কিনী বই পড়ার অভ্যেসও কম, এসেছিও এদেশে নতুন, তাই বোকা বনে আছি। বাপের জন্মে বউকে মধু বা চিনি বলতে শুনিনি।

হাউ-আর-ইউয়ের ধাঁধাটাও বললুম। আশরাফ হাসতে হাসতে বলে—ওটা হচ্ছে হাউ-ডু-ইউ ডু-র আমেরিকান এডিশন, দেখা হলেই বলবে। আর, এখানে যতদিন থাকবি, 'হায়-হায়' করে তোর অষ্টপ্রহর কাটাতে হবে। ওরা হ্যালো-ট্যালোর ধার ধারে না। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে—হা-ই। এলিয়ে দেওয়া উচ্চারণে শোনায় হা-য়।

সব শুনে লজ্জায় মরে যাই। এফ বি আই চুলোয় যাক, মিসেস ফারারকে আমার পেট ব্যথার কথাটা বলতে গেলুম কেন।—ঈ—স্। না, এবার থেকে সাবধান হতে হবে।

কিন্তু এমনই কপাল, মার্কিন বুলিতে পার পাওয়া কঠিন। একে ওদের উচ্চারণ সামাল দিতেই প্রাণ যায়, উপরন্তু এমন সব শব্দ শুনি, যার মানে বের করতেই আমার ইংরেজি বিদ্যের পানসি মাঝদরিয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে।

এলিভেটর মানে লিফ্‌ট, গ্যাসোলিন পেট্রল ফনোগ্রাফ গ্রামোফোন ইত্যাদি কিছু কিছু রপ্ত করেছি, কিন্তু দেখছি মার্কিন অভিধান ধাতস্থ হওয়া অনেক দিনের ব্যাপার। গিয়েছি প্রফেসর ফ্লয়েড আরপানের বক্তৃতা শুনতে। সাংবাদিকতা নিয়ে চলছে আন্তর্জাতিক সেমিনার। ভারত থেকে আমি ও স্টেটসম্যানের মোহনলাল কোৎরু এবং আরও আঠারটি দেশের প্রতিনিধি একসঙ্গে আছি। বক্তৃতা আর প্রশ্নের পালা শেষ হতেই প্রফেসর আরপান আমার দিকে চেয়ে বললেন—নাউ আমিট্, হীয়ার ইজ ইয়োর স্কেজিউল ফর টু-মরো।

স্কেজিউল! সে জিনিসটা আবার কী? তাও আবার আগামী কালের স্কেজিউল! আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ঈস্, দলের সবাই নিশ্চয়ই আমাকে আহাম্মক ভাবছে। আমি অন্যমনস্কতার ভাব সারা চোখে মুখে এনে প্রফেসারের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইলুম। আমি ছাড়লে কী হবে, কমলি নহী ছোড়া, আরপান আবার বললেন, 'হীয়ার ইট ইজ, ইয়োর স্কেজিউল।'

এক ফালি কাগজ আমার দিকে তিনি ছুঁড়ে দিলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। দেখলুম, কাগজের ফালিতে আমার আগামী দিনের কার্যতালিকার রুটিন, টাইপকরা।

ব্যাপারটা মালুম হল। অ্যাদ্দিন যাকে বলে এসেছি শিডিউল, এখানে এসে আমায় বলতে হবে স্কেজিউল, নিদেন পক্ষে স্কেডিউল।

স্কেজিউল বলতে আমার যেমন কালঘাম ছুটেছে, তেমনি তামাম মার্কিন মুলুক হাঁ করে থাকবে শিডিউল বললে। ডেট্রয়েটে একজনকে জিগগেস করেছিলুম—তোমার স্কেজিউল বল কেন? জবাব শুনলুম—আই হ্যাভ লার্ন দিস ইন মাই স্কুল।—অর্থাৎ কিনা উনি ওটা ওর স্কুলে শিখেছেন। মরে যাই!

মার্কিন কেতা জানা না থাকলে বিপদ শুধু ভাষায় নয়, অন্য ব্যাপারেও। তবে কিছুদিন থাকলেই সব বোলচাল, সব কেতা কানুন সড়গড় হয়ে যায়। সড়গড় যে হয়েছে তার ছাপ প্রথম ফোটে পোশাকে। মেপে মেপে কথা বলা, আর চেপে চেপে পথ চলা দেখলেই টের পাওয়া যায়, এতদ্দেশে মহাশয়ের আগমন সাম্প্রতিক। তেলচুকচুক কেতাদুরস্ত চেহারা দেখলেই মালুম হয় ইনি কোন বিদেশী ছাত্র বা অধ্যাপক। এবং তিনি সবে এদেশে পা দিয়েছেন।

তবে ভোল পালটাতে বেশিদিন লাগে না। কয়েক মাসের মধ্যেই ওদেশী কথা যেমন রপ্ত হয়, তেমনি খোলস ছাড়তে ছাড়তে কয়েক হপ্তায় মার্কিনী চেহারাও বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে বাদ পড়ে কোটের পকেটে রুমালের উঁকিঝুঁকি। দ্বিতীয় হপ্তায় বাদ পড়ে কোট-নেকটাই। তৃতীয় হপ্তায় ফুলশার্টের হাতা লাফিয়ে ওঠে কনুইয়ের উপর। চতুর্থ হপ্তায় কালো চুলের রাশ মাথা থেকে বেপাত্তা, তার বদলে কদম ফুলের বাহার। পঞ্চম হপ্তায় শার্টের নির্বাসন ওয়ার্ডরোবে, তখন গায়ে চড়ে ভার্সিটি ব্লেজার। অবশেষে ষষ্ঠ হপ্তায় গোড়ালির গোড়ায় লাথি মেরে ট্রাউজারও উঠে পড়ে হাঁটুর কাছে। সব মিলিয়ে আপাদমস্তক মার্কিনী ছাপ, বিদেশী অতিথি পুরোপুরি 'মিস্টার আমেরিকা' এবং তকখুনি তার মুখ থেকে বেরোবে—হা-ই।

মোটকথা, ভাষার আর পোশাকের ধাক্কা সামলে উঠতে পারলে মার্কিন-প্রবাস অনেক সহজ। আবার ছয়মাস পার করেও অনেক সময় দেখা যায়, অনেক কিছুই ধাতস্থ হচ্ছে না। ইণ্ডিয়ানা ইউনিভারসিটির জার্নালিজম বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছু ক্লাস করেছিলুম। রকম-সকম দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কলকাত্তাই বাঙাল, তাই ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকেছি। দেখি, ডেসকের উপর সারি সারি ছাইদানি। কী ব্যাপার, অধ্যাপকদের কমনরুমে ঢুকে পড়িনি তো?

সন্দেহের নিরসন মুহূর্তে। হা-ই হা-ই করতে করতে এক পাল ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। সব জোড়ায় জোড়ায়। প্রত্যেক ছেলের বগলে একটি ক্রুরে মেয়ে। দু' তরফের পোশাকই উপর এবং নিচ

দু'দিক থেকে কমতে কমতে এক জায়গায় মিলব মিলব করছে। আর প্রায় সকলের মুখেই আগুন। সিগারেট জ্বলছে।

প্রফেসর এলেন, ক্লাস বসল, বক্তৃতা চলল, সিগারেট তবু অনির্বাণ। কোন অস্বস্তি নেই। এবং আরও তাজ্জব-কি-বাত, চেয়ে দেখি মেয়েগুলো ছেলেদের সঙ্গে জড়াজড়ি করেই নোট নিচ্ছে। অনেকে আবার সহপাঠীর কোলের উপরেই। প্রফেসরের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্য কারও চিত্তবৈকল্য নেই, আমিই কেবল লজ্জায় চোখ দুটোকে ব্ল্যাকবোর্ডে আটকে রাখার চেষ্টা করছি। আমি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, কো-এডুকেশনের মক্কায় শিক্ষাদীক্ষা, তবু এতটা 'প্রগতি' আশা করিনি।

এতো গেল নিরামিষ ব্যাপার, রামধাক্কা খেলুম খেলার মাঠে। ক'দিন থেকেই হৈ হৈ কাণ্ড। ইণ্ডিয়ানার সঙ্গে নর্থ ওয়েস্টার্নের ফুটবল খেলা। ব্লুমিংটনের স্টেডিয়ামে। ফুটবলের নাম শুনে আমি উল্লাসিত। যাক, এতদিনে চেনা একটা ব্যাপার দেখা যাবে।

মাঠে গিয়ে কিন্তু আবার বোকা বনলুম। আমাদের ফুটবল আর মার্কিন ফুটবলে আসমান-জমিন ফারাক। এদেশে নামেই ফুটবল, কুষ্মাণ্ডাকৃতি যে গোলাকার পদার্থটি নিয়ে মাঠে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড চলে, তার সঙ্গে ফুট-এর তেমন সম্পর্ক নেই। দু'ঘণ্টা খেলার ফাঁকে ফাঁকে ব্যাণ্ড, সুন্দরীদের ঠ্যাংতোলা ড্রিল। আর খেলোয়াড় পরিচয় দিয়ে মাঠে যারা লড়াই করতে নামলেন, তাদের পোশাকের উপর দিকটা অ্যাসট্রোনটের, তলার দিক বুলফাইটার মাতাদোরের। ইয়া তাগড়াই চেহারার গুণ্ডা প্রকৃতির কতকগুলো মাঠে নেমে যা গুঁতোগুঁতি আর ঘুঁসোঘুঁসি করল, তাকে আর যাই বলা হোক, ফুটবল বলা চলে না।

খেলার কিছুই বুঝলুম না। খেলার পর সঙ্গী মার্কিন সাংবাদিক বন্ধু বললেন, চল, তোমাকে কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'। ভয়ে ভয়ে ড্রেসিং রুমের দিকে গেলুম। দু' তরফের কাপ্তান এলেন এগিয়ে। একজন শাদা, একজন কালো। দু'জনেই হাত বাড়ালেন হ্যাণ্ডশেক করতে। দু'টো থাবার দিকে চোখ পড়তেই

আঁতকে উঠলুম। সর্বনাশ, আমার আঙুলগুলো এবার গেল। কিন্তু বিদেশে ভারতমাতার মর্যাদা রাখতে বীরের মত সদর্পে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিলুম এবং একটি হিংস্র থাবার গুহায় আমার পাঁচটি আঙুল নিরুদ্দেশ। তারপর কয়েকটি শব্দ—মড়্ মড়্ মড়্।

হাত যখন ফেরত এল, আঙুলে আর হাড়গোড় কিছু নেই। বুঝলুম বাংলায় 'করমর্দন' কথাটা কত অর্থবহ। তবে এই শব্দটিও এদের রাক্ষুসে হ্যাণ্ডশেকের কাছে অতীব মোলায়েম।

পরবর্তী আক্রমণের আশঙ্কায় হাত দুটো প্যান্টের পকেটে পুরে এবং সন্তর্পণে উঃ আঃ করতে করতে যখন আরও সামনে এগিয়েছি, দেখি এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। শাদা এবং কালো সব অতিকায় দৈত্য সম্পুর্ণ উলঙ্গ। ঘুরছে ফিরছে কথা বলছে অটোগ্রাফ দিচ্ছে। আমি চোখ বুঁজলুম।

পরে জেনেছি এটাই স্বাভাবিক। এতো খেলার স্টেডিয়াম, ছেলে-মেয়েদের হস্টেলের বাথরুমগুলো বেবাক বেআব্রু। কোন আগন্তুক এলে নির্দ্বিধায় স্নানের জল গায়ে সোজা বেরিয়ে আসতে বাধা নেই।

সঙ্গী মার্কিন বন্ধুকে বললাম, আর আলাপে কাজ নেই ব্রাদার, চল, বাড়ি যাই। একে আঙুলের ব্যথা, তদুপরি চোখের এই যন্ত্রণা।

ঘরে ফিরে দেখি, একটা চিরকুট। আজ রাত দেড়টায় ন্যাসন-দম্পতির গৃহে নিমন্ত্রণ। সম্প্রতি আলাপ, থাকেন ব্লুমিংটন থেকে আশী মাইল দূরে। চিরকুটেই লেখা, তুলে নেবেন, ফেরত দেবেন।

অদ্ভুত ব্যাপার! রাত দেড়টায় আবার কিসের খানাপিনা? তা'ও আশী মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে?

পরে জানলুম, এটাও এক ধরনের মার্কিন কেতা। ওদের কাছে রাত দেড়টা আশী মাইল—কিছুই না। কিন্তু পেটের ব্যথা নাহয় নেই, আঙুলের ব্যথা যে ক্রমেই বাড়ছে। ঠিক করলুম যাব না।

চিরকুটে ন্যাসনদের ফোন নম্বর লেখা ছিল। নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখানের ভাষাটা মার্কিন ইংরেজিতে কেমন হয়, বার তিন মনে মনে মক্সো করে নিয়ে রিসিভার তুললুম। ডায়াল করতেই ওপাশে পাখির মত সুরেলা

সরু আওয়াজ। মিসেস ন্যাসন কথা বলছেন।

পরিচয় দিতেই রিসিভারে ভেসে এল,—হাঁউ আঁর ইঁউ দি স ইভ্নিং?

এতদিনে সব জেনে ফেলেছি। চুয়িংগাম চুষে চুষে কথা বলার কায়দায় একটু বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নাকি স্বরে চটপট জবাব দিলুম—ফাঁইন, হাঁউ আঁর ইঁউ?

মার্কিন কেতা রপ্ত হওয়ার আনন্দে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখানের কথাটা বলতে ভুলে গেলুম। আঙুলের ব্যথাও ভুলে গেছি। মুখে শিস্ দিতে দিতে মাঝরাত্তিরের নেমন্তন্নের জন্যে তৈরি হতে চললুম আস্তানায়।

আলোচনার বিষয় মুখরোচক। মারকিন নারী। মারকিন দেশের ক'জন অবিবাহিতা অসতী এবং সহজলভ্যা, সে বিষয়ে রসমধুর গবেষণা চালাচ্ছে গ্যালাঘার। তার সঙ্গে ফোড়ন কাটছে রাল্‌ফ। দু'জনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সেই আলোচনাকে আরও সারগর্ভ, আরও সরস করে তুলেছে। আমি শ্রোতা।

রাল্‌ফ সোডা আর নীল গ্যালাঘার—দু'জনেই আমার সহকর্মী, নিউ ব্রানসউইকের 'দি হোম নিউজ' কাগজের রিপোর্টার। ১৯৬৪ সালে নিউ জার্সির এই শিল্প প্রধান শহরের খবরের কাগজটিতে আমি কাজ করতে এসেই রাল্‌ফ আর গ্যালাঘারের মত দু'জন মাইডিয়ার বন্ধু পেয়ে যাই। নিউ ব্রানসউইক নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল চল্লিশ দূর।

গ্যালাঘার বললে, গত বছর সমীক্ষা চালানো হয়েছিল মারকিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। দেখা গিয়েছে, শতকরা ৭৬টি মেয়ে বিয়ের আগেই বিয়ের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। ইউনিভারসিটি ক্যামপাস-গুলোয় যা কাণ্ড চলে, বুঝলে ভায়া, কিছুদিন ঘুরলেই দেখতে পাবে।

রাল্‌ফ বললে, না নীল, শুধু ক্যামপাসগুলোর দোষ দিও না, বাড়িতেও একই অবস্থা। শুক্রবার রাত্তিরে মেয়ে বাড়ি থাকলে মা ভেবে সারা। কী ব্যাপার, কিছু অঘটন ঘটল নাকি। শুক্রবার উইক-এণ্ডের রাত শুরু। মা ভাবেন অন্য বাড়ির মেয়ে ছেলে-বন্ধু নিয়ে ফুর্তি করতে বেরিয়েছে, ফিরবে রাত কাবার করে। আমার মেয়ে কিনা পড়ার ঘরে বসে সময় মাটি করছে!

কথায় কথা বাড়ে। আমি রাল্‌ফকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ শ্রীমান। আজ আমার ওখানে তোমার যাওয়ার কথা ভুলে গেলে নাকি? তোমার বউয়ের সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ করব যে!

আমার কথায় হুঁশ হল দু'জনের। পাঁচটা বাজে। সান্ধ্য কাগজ, অফিস ছুটি হয়েছে চারটায়। আড্ডা মারতে মারতে এক ঘণ্টা কাবার।

তিনজনে বেরোলুম। গ্যালাঘার ওর গাড়িতে উঠে বাড়ির পথ ধরল। ও যাবে প্রিন্সটনের দিকটায় কেনডাল পার্কে। আমি উঠলুম রাল্‌ফের গাড়িতে। সোজা চলে এলুম আমার আস্তানায়।

আমি থাকি ইউনিয়ন স্ট্রিটে। খাস রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায়। যাকে বলে ইউনিভারসিটি ক্যামপাস। গ্যালাঘার জানে না, ইতিমধ্যেই কলেজ ছাত্রীদের কাণ্ডকারখানা অনেক কিছু আমি দেখে ফেলেছি।

ইউনিয়ন স্ট্রিটে আমি থাকি পেয়িং গেস্ট হয়ে। রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দু'চার জন ছাত্র থাকে ওই বাড়িতে।

আমার ঘরে রাল্‌ফ মারকিন মেয়ে সম্পর্কে আর এক দফা জ্ঞান দিল। এ দেশের মেয়েদের নৈতিক অবনতি কত সুদূরপ্রসারী সে বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতাই প্রায় সে ফেঁদে বসল। বলল, এক এক সময় তাই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, ভাবি এদেশ ছেড়ে পালাই। আমার স্ত্রীরও ঘেন্না ধরে গিয়েছে এখানকার সমাজে। লানা-র সঙ্গে তোমার একদিন আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে ও অন্যরকম। শুনেছি তোমাদের ইনডিয়ায় এসব নেই। ওখানে জায়গা দেবে আমাদের দু'জনের?

নিশ্চয় নিশ্চয়—আমি সানন্দে সম্মতি দিয়ে বলি—ঠিকই বলেছ রাল্‌ফ, আমাদের দেশের নীতিজ্ঞান অন্য রকম, বিশেষ করে গ্রামে, তবে তোমার বউকে মাথায় সারাক্ষণ দেড়হাত ঘোমটা টেনে থাকার জন্য তৈরি হতে বল।

ঘোমটা! সে আবার কী, রাল্‌ফ আকাশ থেকে পড়ে। আমি সবিস্তারে আমার দেশের বিপরীত দিকটা বলি। রাল্‌ফ হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, এও কম মারাত্মক নয় দেখছি, তার চেয়ে বরং চল, আপাতত একটু বাইরে বেরোই।

বেরোতে পারি এক শর্তে। কী রকম?

গাড়ি নয়, হাঁটব। তোমাদের দেশে হাঁটার সুযোগ পাচ্ছি না।

রাল্‌ফ হেসে বলে—ঠিক আছে, চল খানিকক্ষণ হেঁটেই আসি; তারপর ফিরে এসে বাড়ি যাব, আমার বাড়ি তো বেশি দূরে নয়। গাড়ি এখানেই থাকুক।

হু'জনে আবার বেরোলুম। রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনান্ত—ছুটি খানিক আগে হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরে ফিরছে। বই খাতা হাতে সব জোড়া জোড়া। মেয়েদের কেউ দয়িতের বাহুলীনা কেউ বক্ষলগ্না। ওদের খিলখিল হাসির আওয়াজ পেছনে ফেলে আমরা শহরের দিকে এগিয়ে চলি।

অক্টোবরের শেষ। হৈমন্তী 'ফল'-এর ফসল গাছের পাতার রঙ বদলানোর পালা শেষ। এবার পাতা খসানোর সময়।

ইউনিয়ন স্ট্রিট, আর কলেজ এভিনিউ ছেড়ে সামনে খানিক এগিয়ে পৌঁছলুম লাইব্রেরির সামনে। চারধারে গাছ আর গাছ। গাছের তলায় বেঞ্চি। বেঞ্চিতে আবার সেই জোড়া-জোড়া, তুজনে মুখোমুখি। কিংবা বলতে পারেন বুকোবুকি। রাল্‌ফকে বললাম—না এখানে আর নয়, বেশিক্ষণ থাকলে চিত্তে বিকার দেখা দিতে পারে। কেন, ভয় কিসের—রাল্‌ফ বলে, চাও তো তোমার সঙ্গে, এসো, কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'।

আমি ভয় পেয়ে বলি—না বাবা কাজ নেই। শিকাগোর সেণ্টক্লেয়ার হোটেলে রাত দেড়টায় আমার ঘরের দরজায় কে যেন টোকা মারে। দরজা খুলে দেখি জ্বলজ্যান্ত একটি মদিরাক্ষী মারকিন যুবতী। কোথায় ঘরে এনে আদর করে বসাব, আমার তখন বুক তুরুতুরু। ভয়ের চোটে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কাওয়ার্ড—রাল্‌ফ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে।

না হে না কাওয়ার্ড নই, বিদেশ-বিভুঁইয়ে কোন প্রকার এড্‌ভেনচারে আমি নারাজ—আমার সাফ জবাব।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হব-হব! নিউ ব্রানসউইক আলোর মালায় উজ্জ্বল; আর গাছের অজস্রতায় আলো আঁধারির খেলা। আমরা এদিকে রেলপুলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। পুল পেরিয়ে সামনে এগোতেই রেল স্টেশন।

রাল্‌ফের আবার সকৌতুক জিজ্ঞাসা, কোন লাস্যময়ী মারকিনীর সঙ্গে তু'দণ্ড আলাপ করতে তোমার আপত্তি নেই তো?

তা থাকবে কেন—আমি বীরপুরুষের ভাব দেখিয়ে বলি।

আমার কথা শেষ হল না। রেল স্টেশনের টেলিফোন-বুথ থেকে ফিটফাট একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ঠিক আমাদের সামনে পথ দিয়ে সোজা হনহন করে চলল। পেছন থেকে দেখেই টের পেলুম অসামান্য সুন্দরী। হাঁটার ধরনে যৌবন উপচে উপচে পড়ছে। আমি তন্ময়।

আমার ধরন ধারন দেখে রাল্‌ফ মুচকি হাসল। বলল—ওহে ইনডিয়ান ইয়োগী, কী ব্যাপার, চোখে তোমার কিসের নেশা?

রাল্‌ফের প্রশ্নে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলুম। রাল্‌ফ আবার বলে, জানা আছে সব সাধুপুরুষকে। আলাপ করবে নাকি মেয়েটির সঙ্গে?

দূর, আলাপ করব কেন? আর আমরা আলাপ করতে চাইলে ওই-বা রাজী হবে কেন?

চাও তো আলাপ করিয়ে দি' চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি সুবিধের নয়। চল, ওকে 'ফলো' করা যাক।

রাল্‌ফের কথাবার্তায় মনে হল, আজ সন্ধ্যায় ওর কোন একটা এ্যাডভেনচার করার মতলব।

ওদিকে মেয়েটি এক ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসের সামনে দাঁড়িয়ে উইনডোশপিং শুরু করেছে। রাল্‌ফের পরামর্শে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লুম। মেয়েটি আবার চলতে শুরু করল।

রাল্‌ফের নির্দেশমত আমরাও পেছন পেছন চললুম। মেয়েটি থামে তো আমরা থামি। মেয়েটি চলে তো আমরা চলি। এবার মেয়েটি ডাইনে বাঁক ঘুরল। আমরাও ঘুরলুম। বলা বাহুল্য, মেয়েটি আমাদের দেখতে পায়নি।

রাল্‌ফের মুখে দুষ্টুমির হাসি। বলে, মেয়েটি দারুন খুবসুরৎ দেখছি, যেমন চাউনি, তেমনই চলন। মনে হচ্ছে ডাকলেই সাড়া দেবে।

কী করে বুঝলে?—আমি ততক্ষণে রাল্‌ফের অধীনে এসে গিয়েছি।

বুঝব না কেন,—রাল্‌ফের চটপট জবাব—এদেশের মেয়েদের নাড়ীনক্ষত্র চিনি। কে ভাল, কে খারাপ, আমরা এক ঝলকে বুঝতে

পারি। দেখ দেখ, মেয়েটা ঝুঁকে কী যেন দেখছে। আঁটোসাঁটো পোশাকে এই রকম ঝুঁকলে যা দারুন—

রাল্‌ফের উচ্ছাস হঠাৎ বাধা পেল। মেয়েটি আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। রাল্‌ফ আর আমি একটু আড়াল করে দাঁড়ালুম। না, আমাদের দেখতে পায়নি। মেয়েটি চৌমাথা পার হয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে।

আমরাও আবার পিছু ধরলুম। রাল্‌ফ বললে,—একটা হেস্তনেস্ত করবই।

সিনেমা হলটার সামনে মেয়েটা দাঁড়াল। ষণ্ডা চেহারার দুটি লোক ওখানে ছিল। খানিক দূর থেকে আমরা দু'জনেই দেখলুম—হাসতে হাসতে কী সব কথা বলল মেয়েটি ওদের সঙ্গে। এক জনের কাঁধে হাত পর্যন্ত রাখল কথা বলতে বলতে।

রাল্‌ফ ফিসফিস করে বলে—কী, ঠিক বলেছি কিনা। মেয়েটি নির্ঘাৎ ফ্লারটিং টাইপ।

আবার যাত্রা শুরু। মিনিট দুই পর একটা ছোট রাস্তার লাগোয়া দোতলা বাড়ির ভেতরে মেয়েটি ঢুকে পড়ল।

রাল্‌ফ বলল—চল, আমরাও ঢুকে পড়ি।

না-না-না, দরকার নেই—আমি প্রবল আপত্তি জানাই—বরং চল, আমার বাড়িতে ফিরি। কথা ছিল খানিকক্ষণ বেড়াবার! প্রায় এক ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল অনর্থক ওই মেয়েটার পেছন পেছন।

অনর্থক কেন বলছ—রাল্‌ফ উত্তর দেয়—এসো না, আজ তোমাকে একটা ভাল অভিজ্ঞতা করিয়ে দিই। এদেশে এলে, আর কিছুই করলে না, তোমার দেশী বন্ধুরা পরে বলবে কী?

আমার কোন ওজর না শুনে রাল্‌ফ আমাকে হিড় হিড় করে টেনে তুলল বাড়ির ভেতর। সামনেই দোতলা যাবার সিঁড়ি।

এক একটা সিঁড়ি ভাঙছি, আর আমার বুকের ধুকপুকুনি বাড়তে শুরু করছে।—আচ্ছা রাল্‌ফ, সত্যি সত্যি যদি মেয়েটি খারাপ না হয়। তাহলে তো ভীষণ বিপদে পড়ব—।

আরে না-না, ভয় পাবার কিছু নেই—রাল্‌ফের উত্তরে কোন উত্তেজনা নেই।

আচ্ছা রাল্‌ফ, মেয়েটি কিছু জিগগেস করলে কী বলব?

রাল্‌ফ হাসে, বলে—ও, ইচ্ছেটা এতক্ষণে চাগিয়ে উঠেছে দেখছি! তা তোমার কিছু করতে হবেনা, আমিই সব ম্যানেজ করব।

আচ্ছা রাল্‌ফ, মেয়েটি টাকাকড়ি চাইবে না তো, আমার কাছে কিন্তু বেশি ডলার নেই।

আমার অনবরত প্রশ্নে রাল্‌ফ খেঁকিয়ে ওঠে—চুপ করতো দেখি, আমার পকেটে ঢের ডলার আছে। অবশ্যি তার একটিও লাগবে না। মেয়েটি এমনিতেই ধরা দেবে। দেখলে না, সিনেমা হলের সামনে কী রকম ঢলে ঢলে কথা বলছিল।

সিঁড়িভাঙা শেষ। দু'জনেই দোতলায় হাজির, দোতলায় একটি মাত্রই ফ্ল্যাট। রাল্‌ফ দেখেছে, মেয়েটি দোতলাতেই উঠেছে। আর ফ্ল্যাট যখন একটি মাত্রই তখন খোঁজাখুঁজির ঝামেলাও নেই। রাল্‌ফ কলিং বেল টিপতে যাচ্ছে। আমি বাধা দিলুম।—ধরো, ওর মা-বাবা যদি বাড়ি থাকে। আর আমাদের দেখে তাড়িয়ে দেয়—

রাল্‌ফ—আমি জানি, কেউ নেই।

আমি—ধর, যদি মেয়েটির অন্য কোন বন্ধু ভিতরে থাকে?

রাল্‌ফ—আমি জানি, তাও নেই!

আমি—কিন্তু, কিন্তু—

রাল্‌ফ—আবার কিন্তু কিসের?

আমি—না ভাই, ফিরে চল।

রাল্‌ফ—তা কী করে হয় এত কাছে এসে ফিরে যাওয়া যায় না।

আমি—কিন্তু—

সর্বনাশ, আমার কিন্তুর অপেক্ষা না করে ওদিকে রাল্‌ফ বেল টিপে দিয়েছে।

বাজনা থেমেছে। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়—এখনই দরজা খুলে যাবে—হায় ভগবান, রাল্‌ফ হতভাগা আমায় কী বিপদের মধ্যেই না

টেনে আনল। এখন উপায়? বরং পালিয়ে যাই—

আমার মুহূর্ত-ভাবনার মাঝখানেই চিচিং ফাঁক—দরজা খুলে সেই সুন্দরী রমণীর আবির্ভাব। এবং দরজার গোড়াতেই রাল্‌ফকে জড়িয়ে ধরে—

আমি চোখ বুঁজে ফেলি। সত্যিই তো, রাল্‌ফ তো ঠিকই বলেছে। বেটা পাকা জহুরী।

ওদিকে রাল্‌ফ চেঁচাচ্ছে—ছাড় ছাড়, সঙ্গে গেস্ট আছে। মেয়েটি হাত সরিয়ে থমকে দাঁড়াল। কটাক্ষ হেনে তাকাল আমার দিকে।

রাল্‌ফ আমাকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল মেয়েটির সামনে। তারপর বললে, আলাপ করিয়ে দিই,—আমার ইনডিয়ান ফ্রেন্‌ড, যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি। আর ইনি হলেন গিয়ে আমার এই ফ্ল্যাটের, গৃহিণী লানা—লানা সোডা, আমার বউ।

আমি ধপ্‌ করে বসে পড়লুম। মাথা বন বন ঘুরছে।

সেই মেয়েটি, থুড়ি, লানা হতভম্ব। আমাদের দুজনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল তাকায়। আমি অতি কষ্টে উঠে সোফায় বসে অস্ফুট স্বরে খাস মাতৃভাষায় বলি—হতভাগা! তোর মনে এত সব ছিল?

লানা রাল্‌ফের কাছে গিয়ে সবিস্ময়ে তখন প্রশ্ন করছে—ডারলিং কী ব্যাপার বলতো, তোমার গেস্ট কেন অমন করছেন, ফিটের ব্যারাম আছে নাকি?

তরমুজ উৎসব

অনেকে বলেন, দ্বিতীয় দশকের সেই জাজের যুগ আবার ফিরে এসেছে।

আমেরিকায় থেকে দেখে এসেছি, গোটা মারকিন মুলুক আবার রাতভর নাচতে শুরু করেছে। তবে জাজের চেয়েও ঝাঁঝ ওতে বেশি।

কী বাজনা, কী দেহভঙ্গী—সব কিছুই আরও উদ্দাম। শুধু দেহ নয়, মনটাকেও দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলার জন্য পণবদ্ধ। এ যুগের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী তার পায়ে সর্বস্ব সমর্পণে বেরিয়ে পড়েছে এবং গাছের তলায়, ঘরের আঙিনায়, পথে-ঘাটে, ক্লাবে, পার্টিতে সর্বত্র চলছে তাদের দেহের "আন্দোলন"।

এই "আন্দোলনের" নাম ট্যুইস্ট। কলকাতায় থাকতে হোটেলে পার্টিতে এই ট্যুইস্ট নাচের সঙ্গে পরোক্ষ পরিচয় কিঞ্চিৎ ছিল, কিন্তু সে নিতান্তই মোলায়েম ব্যাপার। আমেরিকায় অন্য জিনিস। এবং এই "ট্যুইস্টেড-এজের"র একটি গণ-নৃত্যের বা "গণ-আন্দোলনের" সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় সেখানে পৌঁছবার কয়েক দিন পরেই।

ওয়াশিংটন থেকে এসেছি ব্লুমিংটন। নেমেই সবার মুখে শুনি "ওয়াটারমেলন ফেসটিভেল" অর্থাৎ বার্ষিক "তরমুজ-উৎসবে"র কথা। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহেই নাকি হয়। প্রফেসর ইয়োকাম আর প্রফেসর আরপান দুজনেই অনবরত বলতে থাকেন, ডোন্ট মিস দিস আমিট, দারুন ব্যাপার।

ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক প্রত্যেকের মুখেও এছাড়া অন্য কথা নেই। আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বর্ষামঙ্গল বসন্তোৎসবের আবহাওয়ায় মানুষ, এখানকার এই বিশ্ববিদ্যালয় শহরের তরমুজ উৎসবের একটা মনোরম দৃশ্য কল্পনায় গেঁথে রাখি।

রাত আটটা বাজতে না বাজতেই যথাস্থানে গিয়ে হাজির। কিন্তু কোথায় সেই বসন্তোৎসবী আবহাওয়া? ইউনিভারসিটি ক্যামপাসের ভিতরেই কার পার্কিংয়ের বিরাট জায়গা। সেখানে আলোয় আলোয় চোখধাঁধানি ব্যাপার এবং চিৎকার চেঁচামেচিতে কানের অন্তঃপুরে ধুন্ধুমার কাণ্ড।

ভয় পেয়ে গেলুম। ব্লুমিংটন তো আধুনিক শহর, কিন্তু শব্দ কল্পদ্রুমের চোটে তো মনে হচ্ছে রুয়ান্ডা উরুনডির কিংবা মকচঙের কোন গভীর অরণ্যে এসে পৌঁছেছি। 'হুই-হাই' চিৎকার আর তিড়িং বিড়িং ফড়িং-নাচের উপযোগী যন্ত্রণা-সংগীত। চোখ বুঁজতেই মনে হল, অগ্নিকুণ্ডের চারধার ঘিরে বাইসনের চামড়ায় তৈরি ঢাকের আওয়াজ চলছে। চলছে বল্লমধারী অর্ধ উলঙ্গ আদিবাসীর আদিম উল্লাস।

চোখ মেলতেই দেখি, গোটা জায়গা জুড়ে হাজার খানেক ছেলে মেয়ে বিস্রস্ত বসনে, উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে উন্মাদের মত লাফিয়ে চলেছে। চুলের ঠিক নেই, পোশাকের ঠিক নেই, পায়ের দাপাদাপিতে টেনিস লনের ভিত ফাটে ফাটে।

বাজনার লয় যত বাড়ে, দাপাদাপি ওঠে চরমে। উপরন্তু দাঁত মুখের খিঁচুনি দেখে মনে হল, হয় সবাইকে মৃগীরোগে ধরেছে কিংবা ভূতে পেয়েছে,—এখনই ওঝা ডেকে আনা দরকার।

প্রত্যেকের চোখে কিসের যেন ঘোর। সবাই অতি দ্রুত দুলছে, হেলছে, টলছে। এবং সংক্ষিপ্ততম পোশাকে বেআব্রু মেয়েদের সামনাসামনি ঘুরপাক খেয়ে চলেছে রঙের দোকানের বিজ্ঞাপনের মত রামধনু জামা প্যাণ্ট পরা তাগড়াই তাগড়াই ছেলেরা। হঠাৎ মনে হল, নাচের নেশায় মাতাল ওই ছেলেদের কয়েকজনকে যেন আমাদের বিজয়া দশমীর মিছিলে দেখেছি।

বুঝলুম, এই হচ্ছে তরমুজ-উৎসব। অর্থাৎ ট্যুইস্টের "গণ-নৃত্য।"

আসরের মাঝখানে মঞ্চোপরি কতিপয় তরুণ, হাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্র, মুখে সংগীত নামধারী সেই 'হুই-হাই' আওয়াজ এবং বীটল্‌স্‌দের নকলে প্রত্যেকের কপালে চুলের বাহার। ওই মঞ্চ ঘিরেই শত

শত ঘোরলাগা তরুণ-তরুণী হাত পা ছড়িয়ে নিম্নাঙ্গে ঊর্ধ্বাঙ্গে ভূমিকম্প লাগিয়ে দিয়েছে। নাচের এমনই দাপট, অনুমান করতে পারি, দেহের ভিতরকার যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই ঠাঁই বদল করে নিয়েছে।

দেহের 'আন্দোলন' বা 'বিক্ষোভ' যাই বলি না কেন, উৎসব যে চলছে, তা চোখে দেখে ততক্ষণে টের পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু 'তরমুজ' শব্দটি সঙ্গে জোড়া কেন? কারণ আছে। নাচ শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সুন্দরী নির্বাচন করে বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রেসিডেণ্ট তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন মেয়েটির ঠোঁটের রঙের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া লাল টুকটুকে তরমুজের একটা টুকরো।

সেবার তরমুজ-সুন্দরীরূপে নির্বাচিত হয় প্যাট রেলীয়া নামে একটি মেয়ে। শত-সখী-পরিবৃতা রেলীয়া উপস্থিত সবাইকে স্বহস্তে বিলিয়ে দিল অজস্র তরমুজের অসংখ্য খণ্ড।

যে গিয়েছে, সে-ই পেয়েছে বিনি পয়সায়। আর পেয়েছে তরমুজ-সুন্দরীর হাসির টুকরো। ফাউ।

এই খাওয়াটাকে কেন্দ্র করেই ট্যুইস্ট নাচের ওই সর্বজনীন মহোৎসব। তরমুজটা গৌণ, নাচই আসল।

নতুন চেনা দু'একজন আমাকে কনুই মেরে দাঁতখিঁচুনি ওই নাচের মাঝখানে ঠেলতে চেয়েছিল। পারে নি। আমার পাশে ছিল ক্যাথি জুলিয়ান আর ব্রায়ান ক্যেনিগ। সেখানকারই ছাত্রছাত্রী। তারা তো টানাটানিই শুরু করে দিল। আমার গলা থেকে তখন প্রতিবাদের যে-শব্দ বেরোল, আসলে তা' অনেকটা 'হেলপ হেলপ' আর্তনাদেরই অনুরূপ। শেষমেষ ক্যাথি আর ব্রায়ান হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই নেমে পড়ল ওই কুরুক্ষেত্র-আসরে।

নামার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে অন্য মানুষ। এতক্ষণ বেশ সভ্যভব্যের মত কথা বলছিল, 'তাধিন—তাধিন' ঘোর লাগতেই চেনা মানুষ অচেনা।

গতিক সুবিধের মনে হল না। ব্যাপারটা ছোঁয়াচে। ক্যাথি আর ব্রায়ান যখন ও জগতে, চটুল বাজনার তাল যখন আরও উদ্দাম, নাচের লয় আরও প্রলয়ংকরী, আমি চুপি চুপি বাড়ির পথ ধরলুম।

কিন্তু ঘরে পৌছেও নিস্তার নেই, মাথার ভিতর ব্যানজো আর স্যাকসোফোন তখনও অনবরত বাজছে। আর বাজছে বিটকেল বীটল-গানের একটি কলি—প্লীজ, প্লীজ মি—

পরদিন প্রফেসর স্যাভেজের বাড়িতে নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ। স্যাভেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। মাইডিয়ার লোক। সেখানে কী কুক্ষণে বলতে গিয়েছিলাম, ট্যুইস্ট নাচের ওই আসরে আমার গা গুলিয়েছে। কথা শেষ হল না, স্যাভেজের অষ্টাদশী কন্যা ভিকি আমায় প্রায় তেড়ে মারতে আসে। তার সঙ্গে যোগ দেয় কনিষ্ঠা ভারজি আর স্যাভেজ জুনিয়র। আমার মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ—

ইমপসিব্‌ল, কোন সুস্থ পুরুষ মানুষ এইভাবে ট্যুইস্টের নিন্দা করতে পারে না।

তিন ছেলেমেয়ের ভাবভঙ্গী দেখে অধ্যাপক ও অধ্যাপকিনী হো হো করে হাসেন, আমি মজা পাই।

ট্যুইস্টের সঙ্গে এপিলেপ্সির তুলনা পুনর্বার করা মাত্র ভিকি রেগে আগুন। বলে, "এ হতেই পারে না, আপনি নিশ্চয়ই বানিয়ে বানিয়ে বলছেন, ট্যুইস্টের কদর বোঝে না এমন লোক থাকতে পারে না বিংশ শতাব্দীতে।" স্যাভেজ জুনিয়র আমার দিকে এমন কটমট তাকায় সত্যযুগ আর ভারতবর্ষ হলে, নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেতাম। আর ভারজি! আমার মন্তব্যে বেচারা এমনই ম্রিয়মান যে, তাকে তখন দক্ষযজ্ঞের পটভূমিকায় সতীর মত দেখাচ্ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের ছিঁটেফোঁটা থাকলে পতি অপেক্ষা প্রিয়তম ট্যুইস্টের নিন্দায় সে সেই মুহূর্তে অবশ্যই দেহত্যাগ করত।

করেনি, উল্টে ততক্ষণে ওদের তিনজনের চোখে ট্যুইস্ট নাচের ঘোর লেগে গিয়েছে। কৃষ্ণনামে রাধা আকুল হতেন, এঁদেরও দেখছি নামৈব কেবলম এবং কোথায় রইল কফির কাপ, পুডিংয়ের বাটি, মুহূর্তে রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে তিনজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ডাইনিং টেবিলের লাগোয়া জায়গায় তিড়িং-লাফ, থুড়ি ট্যুইস্ট শুরু করে দিয়েছে। অবাক

কাণ্ড, পঞ্চাশোর্ধ্ব গৃহকর্তা এবং গৃহিণীরও মাথা ঢুলছে, ওঁরাও 'একসকিউজ মি' বলে উঠে পড়েছেন, উত্তেজনায় উত্তেজনায় মুখর বাজনার তালে তালে কোমর বাঁকাতে, এবং হাত পা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছেন। দর্শকের ভূমিকায় ছাপোষা বাঙালী আমি হতভম্ব।

অধ্যাপক-গৃহিণী নাচতে নাচতেই চোখের ইশারায় আমাকে দু'একবার যোগ দিতে ডাকলেন, আমি ইশারা টের না পাওয়ার ভাণ করে ঠায় বসে রইলুম।

ভেবেছিলুম, ঘরের ভিতরকার এই তরমুজ-উৎসব সারারাত চলবে। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থেমে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

সবাই আবার জড় হলুম এক জায়গায়। অধ্যাপককে জিগ্‌গেস করলুম—এই মোটা শরীর নিয়ে এই কাণ্ডটা করলেন কী করে? অধ্যাপক হেসে জবাব দেন—না করে উপায় কী, নইলে সবাই বুড়ো ভাববে যে! এ দেশে কেউ বুড়ো হতে চায় না।

এতক্ষণে বুঝলুম ব্যাপারটা। 'বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন।' এবং ঘরে-বাইরে সর্বত্র ট্যুইস্ট নামের উপচারে সেই তরমুজ-উৎসবের প্রতিফলন। তরমুজ যৌবনের প্রতীক। নিউ ইয়র্ক থেকে লস এনজেলেস, শিকাগো থেকে নিউ অরলিয়েন্‌স—বিরাট জনপদ ট্যুইস্ট নাচে অভিব্যক্ত সেই শৃঙ্খলহীন যৌবনের অধীন। এমনিতে সুস্থ স্বাভাবিক, কিন্তু যেই শোনা গেল মাতাল বাজনার চটুল সুর, অমনি কোথায় তলিয়ে যায় ক্লাস, কারখানা, অফিস, বাড়িঘর। চোখের তারায় ঢুলতে থাকে বিশ্বজগৎ। এবং সে মুহূর্তে 'সমাজ-সংসার মিছে সব।'

এই তরমুজ-উৎসবের প্রধান পূজারী, বলাই বাহুল্য, কিশোর-কিশোরী আর তরুণ-তরুণীর দল। এদের রীতিনীতি, ধরন-ধারণ আলাদা। সমাজের, প্রেমের ও জীবনের সংজ্ঞা এদের কাছে ভিন্ন। প্রফেসর স্যাভেজের ভাষায় 'লাভ্‌' নয়, এদের কাম্য 'সেক্স'। কেন? তার উত্তর: লাভ ইজ সারেণ্ডার, সেক্স ইজ কনকোয়েস্ট। হু ওয়ানট্‌স টু সারেণ্ডার?

স্যাভেজ কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ব্যাখ্যা করে বলেন—এটাই হচ্ছে এই টুইস্ট যুগের মূল কথা। আত্মসমর্পণে যখন এই অনিচ্ছা, তখন চল, বেরিয়ে পড়ি, মজায় মাতি। সানফ্রানসিস্‌কোর এক ট্যাকসি ড্রাইভার আমায় বলেছিল—রোজ রাত্রে মেয়েরা আমার গাড়িতে ওঠে। বলে, যেখানে মজা, যেখানে ছেলের দল, সেখানে নিয়ে চল।

এদের উপাস্য-দেবতা একা কামদেব নন, রিংগো প্রমুখ বীটল-বালকেরাও। চুল ওদের আদলে, কথা ওদের ধরনে, গান ওদের নকলে। ওদের এমনই জনপ্রিয়তা, মারকিন দেশ সফরের সময় ওরা যে হোটেলে রাত কাটিয়েছিল, তার বিছানার চাদর এক লপ্তে কিনে নিয়ে এক ঝানু ব্যবসাদার এক কোটি ষাট লাখ টাকা কামিয়েছিল। বীটলদের অঙ্গস্পর্শে অমূল্য ওই চাদরের এক এক ফালি এক এক ডলারে স্যুভেনির হিসাবে বিক্রির বিজ্ঞাপন যখন কাগজে টেলিভিশনে বের হল, তরুণ-তরুণী, বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে কী মাতামাতি। দু' দিনের মধ্যে ওই সব স্যুভেনির লক্ষ লক্ষ বুকের শোভা।

এই সব ট্যুইস্ট আর বীটল-পাগল তরুণ-তরুণীর চেহারায় বা পোশাকে বিশেষ তফাৎ নেই। বিশেষ অনুধাবন ব্যতিরেকে বোঝার উপায় নেই কে ছেলে, কে মেয়ে। আঁটোসাঁটো-খাটো পোশাক, উসকোখুসকো চুল, মুখে সিগারেট, চোখে উদ্‌ভ্রান্তি। দিনে এরা এক রকম, রাতে অন্যরকম। রাত যত বাড়ে চেহারার তত বদল হয়।

স্যাভেজ একটু দম নিয়ে বলেন, শুধু তরুণ-তরুণীরাই নয়, এদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি আমরা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার দলও। দেহের স্থূলতা আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে, কর্কশ ত্বক প্রসাধনে ঢেকে নাচের আসরে সমবেত হচ্ছি। ঘরভাঙানি, কুলমজানি ট্যুইস্টের ডাক ফিরিয়ে দেবার সাধ্য কারও নেই।

আমি বললুম,—ঠিকই বলেছেন, নিউ জারসির যে খবরের কাগজে আমি কিছুদিন কাজ করতুম, তার মালিককে একদিন এক ট্যুইস্ট নাচের আসরে বলেছিলুম, ধরুন, কোন রিপোর্টার বা আপনার

অফিসের অন্য কোন কর্মী যদি আপনাকে এইভাবে দেখে ফেলে, যদি অপরিচিতা ওই মেয়েটিকে নাচের পর আপনার বাহুলগ্না দেখে কুৎসা রটায়'? ভদ্রলোক তো হেসেই সারা—আর ইউ কিডিং?—ঠাট্টা করছ?—এভরিবডি ডাজ ইট। হাউ এল্‌স্ কেন ইউ মিট এনিবডি?

আপনার স্ত্রী?

হা-হা-হা—ভদ্রলোক হেসে আকাশ ফাটান।—আরে দেখ গিয়ে, সে অন্য জায়গায় মজায় মেতেছে।

ব্যস, এক উত্তরে আমার বাক্য বন্ধ।

প্রফেসর স্যাভেজ স্ত্রীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসেন। মিসেস সে হাসিতে যোগ দেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলেন—এ যুগের নাচের আবার নানান ধরন। মংকি, ফ্রগ, গোরিলা, ওয়াতুসি ইত্যাদি। নাচের ঘোরে কেউ বাঁদরের মত কাল্পনিক গাছে উঠেছে, কেউ ব্যাঙের মত চার পায়ে লাফাচ্ছে, কেউ গোরিলার মত হাঁক দিচ্ছে। সে এক অদ্ভুত আদিম ব্যাপার।

প্রফেসর আর এক কাপ কফির ফরমাশ দিয়ে কথার মাঝখানেই বলেন, সবচেয়ে জনপ্রিয় অবশ্য 'হুইসকি-এ-গো-গো'। ফরাসীতে যাকে বলে ডিসকোথেক, সেই ভাবে গ্রামাফোন রেকর্ডের সঙ্গে নাচা এই উদ্‌ভ্রান্ত যুগের আর একটি লক্ষণ এবং 'হুইসকি-এ-গো-গো' এমন বাজনার সঙ্গে জমে ভাল। এই নাচের আসর যেখানে, সেখানেই ভিড় বেশি। যারা ঢুকতে পায়না, তাদের কী মাথা-চাপড়ানি। শিকাগোর রাশ এভিনিউয়ের এক ক্লাবে ঢুকতে না পারা এক মেয়েকে চিৎকার পেড়ে বলতে শুনেছি—হোআই আর ইউ কিপিং মি আউট, হোআই কান্ট্ আই কাম ইন? হোআই?

কিছুকাল আগে 'লুক' নামে ম্যাগাজিন এই ট্যুইস্ট-যুগের তরমুজ-উৎসবে উদ্‌ভ্রান্ত ছেলেমেয়েদের এক সমীক্ষা করেছিলেন। তাতে ইনডিয়ানাপোলিসের একজন সমাজতাত্ত্বিক বলেছিলেন—ইট ইজ এ কাইন্‌ড্ অব ফারটিলিটি রাইট, ডিজাইন্‌ড্ টু কমব্যাট দি স্টারিলিটি অব মর্ডান এজ। আগেকার সেই হাতে হাত ধরে আলতোভাবে

কোমর জড়িয়ে মৃদু বাজনার তালে নিষ্প্রভ আলোয় নাচ নয়—ইট ইজ এ সর্ট অব সেকসি ইন এ ক্লীন ওয়ে, অল দোজ বডিজ গ্রাইনডিং বাট—নেভার টাচিং।

তারও চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আর একটি মেয়ের মন্তব্য। মেয়েটি ইনডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী। সে একদিন বলেছিল—আমি এই নাচকে ভালবাসি, এই নাচের যুগকে ভালবাসি। তার কারণ, দে টেক্‌স্ অফ মাই প্রবলেম, অফ সোসাইটি ইটসেল্‌ফ। ইউ ক্যান নট থিংক এবাউট ইনিথিং এলস হোআইল ইউ আর লস্ট ইন দেম। ইউ একজস্ট্ ইওরসেল্‌ফ, দেন ইউ ক্যান ন্যাপ ফর ফিউ আওয়ারস্ উইদাউট এ স্লিপিং পিল। অবসাদ আর ক্লান্তিতে বড়ি না গিলেই আরামের ঘুম। মনে আরাম নেই, সংসারে শান্তি নেই, সমাজে সুখ নেই। হয়ত তারই সন্ধানে এ যুগের ছেলেমেয়েরা, আমরা ছুটে চলেছি। আরাম, শান্তি বা সুখ পেয়েছি কিনা বলতে পারব না, তবে অশান্তি-অসুখ খানিকক্ষণের জন্য ভুলতে পারি। মদের নেশার চেয়ে এ ঢের ভাল।

প্রফেসর স্যাভেজ থামলেন। হঠাৎ খেয়াল হল ভিকিরা নেই। জিগ্‌গেস করি, ওরা কোথায় ?

মিসেস বলেন, ভিকি, ভারজি দুজনেই বেরিয়ে গিয়েছে। আজ শুক্রবার যে! জানেন না, ফ্রাইডে নাইট ইজ পিক আপ নাইট। ভাল কথা, আপনাকে আর এক কাপ কফি দেব ?

বললুম—না, ঘুম পাচ্ছে।

এত তাড়াতাড়ি—মিসেস স্যাভেজের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা—রাত তো মোটে আড়াইটা!

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিই। অপরাধী মনে হল নিজেকে। কী 'বর্বর' আমি, ট্যুইস্ট নাচের ধকল কিংবা স্লিপিং পিল ছাড়াই আমার দু' চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে!

ওদিকে দূর থেকে কাদের যেন খিলখিল হাসির আওয়াজ। হয়ত আর একটা তরমুজ-উৎসবের গৌরচন্দ্রিকা। রাত তো মোটে আড়াইটা।

পশ্চিম-পুব

ইআকিম স্ট্রাসে আর কুরফ্যুরস্টেনডাম যেখানে এসে মাথা ঠোকাঠুকি করেছে, সেই জংশন ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে আছি, আর কলকাতার 'কাঠ বাঙাল' সেজে লোকের গিসগিস্, গাড়ির ছুটোছুটি দেখছি। হঠাৎ গোড়ালির কাছটায় যেন কী? লাফ মারতেই 'খ্যাঁক'। একসঙ্গে ডবল 'খ্যাঁক'।

বেতমিজস্য বেতমিজ, রাসকেলস্য রাসকেল এক কুকুরের বাচ্চার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছি। আর যায় কোথায়! কুকুরটা তো খ্যাঁক করে উঠলই, শেকলধারিণী 'ব্লন্দিনী'ও খেঁকিয়ে উঠলেন। আতুরে নাড়ুগোপালকে কোলে তুলে কট্টর জার্মান ভাষায় গাঁক গাঁক করে তিনি যা বললেন, তার বিন্দু বিসর্গও বুঝলুম না, কিন্তু মনে হল মা-লক্ষ্মী বলতে চান, ওরে মুখপোড়া, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি, দেখতে পাসনি আমি কুকুর নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি!

ওভারকোটের তলায় কেন্নোর মত গুটিয়ে এমন কাঁচুমাচু তাকালুম, সারমেয়বিলাসিনী টের পেলেন, 'বাঙাল' গোস্তাকি মাপ করার জন্য কাতর অনুনয় জানাচ্ছে। তিনি গটমট করে ছুটে এগোলেন, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

গল্প শুনেছিলুম, বার্লিনের যে কোনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়লে হয় কুকুর, নয় কোনো ডক্টরেটের গায়ে নাকি লাগবেই। আজকাল আমাদের দেশেও ডক্টরেট ডিগ্রিধারী আকছার, যে দেশে ঘোড়ার জন্যেও ডক্টরেট দাবি করা হয়, সেই বার্লিনে তো থাকবেই।

কিন্তু এত কুকুর!

তা এই ব্যাপারে বার্লিন আমাদের কলকাতাকেও ছাড়িয়ে যায়। খবর নিয়ে জেনেছি, লাইসেন্সওলা কুকুরের সংখ্যা এই শহরে ৯৭,৮০৩ অর্থাৎ গড়ে প্রতি বাইশ জনে একটি করে কুকুর। বিসমার্ক স্ট্রাসে

ধরে বা কাণ্ট স্ট্রাসে ধরেই হাঁটুন কিংবা গত যুদ্ধের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন বোমাবিধ্বস্ত ভিলহেল্ম চার্চের কিনারে দাঁড়িয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করুন, হাজার হাজার লোক আর মোটর গাড়ির ভিড়ে কুকুরের মিছিলও আপনার নজরে পড়বে। শিকলধারী প্রায় সকলেই মহিলা—তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা। এক হাতে পুরুষসঙ্গীকে বগলদাবা করে এবং আর এক হাতে ঐ শিকল আঁকড়ে হনহন ছুটে চলেছেন। এই ভাবে দু'হাত আটকে রেখে জার্মানরা এত কাজ করে কী করে ভেবে আশ্চর্য হই।

আমাদের সনাতন বাঙালীদেরও অবশ্যি দু'হাত আটক। এক হাতে ধুতির কোঁচা, আর হাতে ছাতা। কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপরীত, নিধিরাম সর্দারের ছোট ভাইয়ের মত। অর্থাৎ কিনা এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তরোয়াল, লড়াই করব কী দিয়ে?

কিন্তু এই জার্মানরা? এদের ময়দানবী শক্তি দেখে তাজ্জব বনে গেছি। যেখানেই যাচ্ছি, দেখছি লাখ লাখ তাজী ঘোড়াকে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে দুর্বার বেগে ছুটছে। ১৯৬২ সালে পশ্চিম বার্লিনে এসে বিশ্বাসই হয় না, বোমার আঘাতে এ শহর মাত্র কিছুদিন আগে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, একখানা বাড়িও আস্ত ছিল না। ফুটবল মাঠের মত চওড়া চওড়া রাস্তা, নতুন নতুন বাড়ি, নতুন বাগান, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়—সব নতুন। এখানে এসেই প্রথম মনে হল জাঁকজমক আর চেকনাইয়ে আমার কল্পনাও হার মেনেছে। চৌরঙ্গীর রাস্তাসমান ইয়া বড় বড় ফুটপাত, দু পা যেতে না যেতেই পথ আগলানো কাঁচে মোড়া রেঁস্তোরা, রকমারি নয়নলোভন বেসাতি এবং দু'চোখকে খাটিয়ে মারার নানা রকম ফন্দিফিকির। বার্লিন নতুন আগন্তুককে পাগলা করে ছেড়ে দেয়।

পশ্চিম বার্লিনীদের মনে কিন্তু ঘুম নেই। ১৯৩১ সালের ১৩ই আগস্ট থেকে তারা ছাব্বিশ মাইল লম্বা দেওয়াল আর কাঁটাতারের ঘেরাটোপে বন্দী। এই বেড়া তারা ভাঙতে চায়। বাইশ লাখ গলা একসঙ্গে আওয়াজ তুলছে—"মাখট ডাস্ টোর আউফ।"—খোল,

ঐ দরজা খোলা। আমার ঠাকুমা, আমার ছোট বোন, আমার বুড়ো বাপ ঐখানে ঐ কাঁটাতারের বেড়াজালে আটক পড়ে আছে, তাদের আসতে দাও।

তা হবার উপায় নেই। বার্লিন আজ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আড্ডাখানা, তাকে নিয়ে তুই শক্তির 'টাগ-অব-ওআর' চলেছে।

বার্লিনে এসে গণ্যমান্য যাঁদের সঙ্গেই আলাপ করেছি সকলেই বলেছেন,—এই আনন্দ, এই বৈভব সব মিথ্যে। যতদিন ঐ বেড়া উপড়ে ফেলা না হচ্ছে, ততদিন আমাদের কারও মনে স্বস্তি নেই। হিটলারের হাতে গড়া ১৯৩৬ সনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে যাবার পথে ব্রিটিশ সেক্টরের একটি পার্কে দেখেছি উঁচু বেদির ওপরে অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলছে। জার্মান বন্ধুটি বললেন, তুই বার্লিনে আর তুই জার্মানি এক না হওয়া পর্যন্ত এই আগুন জ্বলবে।

ব্রাণ্ডেনবুর্গ ফটকের এপারে দাঁড়িয়ে পূব বার্লিনকেও দেখেছি। আমার গাইড বলেছেন, সেখানে বিভীষিকার রাজত্ব। তা কতখানি সত্যি আমি জানিনে। নিজে ভাল করে সব না দেখে পরের কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে শক্ত, কিন্তু সীমান্ত প্রহরীর কড়া নজর এড়িয়ে দূর থেকে যতটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে নিস্তব্ধ, নিঃসাড়।

বারনাউসের স্ট্রাসের এ ফুটপাত পশ্চিমের, ঐ ফুটপাত পূবের, এত দিন যাতায়াত ছিল। আজ ঐ ফুটপাতের গায়ে গায়েই উঁচু দেয়াল, কাঁটাতার এবং অজস্র রাইফেলধারী। দেয়ালঘেঁসা সব বাড়ির দরজা জানালা ইটের গাঁথুনিতে পাকাপাকি বন্ধ। লাফ দিয়ে এপারে ঝাঁপিয়ে পড়ার রাস্তাও নেই। এপারে বাইনাকুলার হাতে কয়েকজন ওপারের তিনতলা চারতলা বাড়ির তু একটি মুখ খুঁজছেন। বোধহয় আপন জন।

বড় করুণ দৃশ্য, বেশিক্ষণ দেখা যায় না। তার চেয়ে ঢের ভাল পশ্চিম বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ঘোরা কিংবা হোটেল আম-জুর লাউঞ্জে বসে কুরফুরস্টেনডামের ছলাকলা দেখা।

হোটেলে পৌঁছতেই দেখি তুই বাঙালী ছাত্র অপেক্ষা করছেন।

সন্তোষ ব্রহ্ম এবং রঞ্জন পিটার্স। সঙ্গে জার্মান-তরুণী—ফ্রলাইন স্টোলপে। সকলেই পরিচিত। তৎক্ষণাৎ কফির অর্ডার এবং আড্ডায় আত্মসমর্পণ।

নিচে হোটেল কাউন্টারে অবিরাম লোকের আনাগোনা, দোতলার লাউঞ্জের ঐ কোণটায় ইতালিয়ান পোশাক-মডেলের ভিড়, পাশের টেবিলটায় এক বুড়ো আপনমনে সান্ধ্যকাগজ 'আবেণ্ড-পোস্ট' পড়ে চলেছেন, অ্যাশট্রেতে চুরুট জ্বলছে আর এই টেবিলে স্টোলপের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমরা কজন বাঙালী খাস বাঙলা ভাষায় আবোল-তাবোল বকে চলেছি।

কথার ফাঁকে রঞ্জন পিটার্স হঠাৎ গুনগুন করে উঠলেন, 'মধু-গন্ধে ভরা'—। খাস গলা।

এবং কী আশ্চর্য, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ পঁচিশে বৈশাখ, আমাদের কলকাতায় আজ উৎসব। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ভিড়, পার্কে বাড়িতে রজনীগন্ধা আর ধূপের ধোঁয়ার সৌরভ। সারাদিন কেমন করে ভুলেছিলাম?

বললুম, আজ এই টেবিলেই আমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করব, পিটার্স গান ধরুন। আর ব্রহ্মভাই তুমিও। তোমার গলাও খাসা।

দুই প্রবাসীরই আপত্তি: না, না, পাশের টেবিলের লোকেরা কী মনে করবে।

আমি কোনো আপত্তি শুনব না। দৌড়ে ঘর থেকে নিয়ে এলুম রবীন্দ্রনাথের ছবি। ফুলদানির টিউলিপ ফুলের গায়ে ছবিকে দাঁড় করালুম।

ততক্ষণে রঞ্জন এবং সন্তোষ দুজনেই গলা খুলে গান ধরেছেন, 'এসো আমার ঘরে এসো'—।

যাত্রাসঙ্গী অন্য সাংবাদিক বন্ধুটিও আর পারলেন না, গান শেষ হতে না হতেই আবৃত্তি সুরু করে দিলেন: 'যখন রব না আমি এ মর্ত্যকায়ায় তখন স্মরিতে যদি হয় মন—'

ইতালিয়ান মডেল এমিলিও শুবার্থ আর তাঁর সঙ্গিনীরা ওদিকে উঁকি মারছেন, পাশের টেবিলের বুড়ো ভদ্রলোক অবাক বিস্ময়ে

তাকিয়ে আছেন, কিন্তু আমাদের টেবিলে তখন সিগারেটের ধোঁয়াও যেন হঠাৎ কেমন সুরভিত হয়ে উঠেছে, টিউলিপ হাসছে। কারণ কুরফ্যুরস্টেনডামে আজ পঁচিশে বৈশাখ।

পরদিন পশ্চিম ছেড়ে পুবে। পূর্ব বার্লিন দেখে ফিরে আসতেই বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলে?

বলা মুশকিল, ছিলুম মাত্র কয়েক ঘণ্টা, সেখানকার জীবনের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হইনি, কী জবাব দিই। শুধু বললুম, ইউরোপে এসে এই একমাত্র শহর পেলুম, যার মাঝ রাস্তা দিয়ে নির্বিবাদে হাঁটা যায়।

প্রশ্নকর্তারা আমার জবাব শুনে হাসলেন, মনে হল খুশিই হয়েছেন। কিন্তু আমি নিজে এখনও ঠিক বলতে পারি না সেটাই গোটা পূর্ব বার্লিনের বা রুশ-অধিকৃত জার্মানির পরিপূর্ণ ছবি কিনা। তবে বাইরে থেকে দেখাই যদি যাচাইয়ের একমাত্র উপায় হয়, তাহলে বলব, আমার সেই জবাবে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি ছিল না।

কী দেখেছি দেয়ালের এবং কাঁটাতারের ওপারে? দেখেছি সান্ধ্য আইন জারি করা এক মৃত শহর, ভাঙা-ভাঙা বাড়ি, বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, সারাইয়ের চেষ্টা নেই, পথে গাড়ি-ঘোড়া আছে কিনা টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ এক সঙ্গে লাগিয়ে দেখতে হয় এবং পথে হঠাৎ কোন লোক দেখলে 'ইউরেকা' বলে চেঁচাতে মন চায়। যৌবন-লাবণ্যরসে উচ্ছল পশ্চিম বার্লিনের পাশে বড় করুণ, বড় বেদনাদায়ক এই ছবি। তবে বছর কয় পর চেহারা সম্পুর্ণ পালটেছে। শুনেছি পূর্ব বার্লিন এখন জমজমাট।

ফ্রিডরিষ স্ট্রাসে বরাবর এগিয়েই চেকপয়েন্ট চার্লি। এখানেই মার্কিন এলাকার শেষ সীমানা। তারপরেই অন্য জগৎ। আমি ভারতীয়, পূর্ব বার্লিনের চেকপয়েন্ট পেরোতে কোন অসুবিধে হয়নি; বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহারই পেয়েছি।

কিন্তু কী করে শহরটা দেখি? কম্যুনিস্ট পুলিসকে ট্যাক্সির কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা কাঁধ নাচাল, খালি গায়ে দুই মজুর রাস্তা সাফাই

করছে, তাদের আকারে ইঙ্গিতে বোঝালুম, 'ট্যাক্সি চাই'। কোন আশার বাণী পাওয়া গেল না।

জনশূন্য পথ ধরে আপন মনেই তাই হেঁটে গিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে শুধু পতাকা আর পতাকা। স্টেট অপেরার পাশ দিয়ে এগিয়ে আলেকজাণ্ডার প্লাৎস্। দু'চারজন লোকের মুখ দেখলুম ; কিন্তু না, ট্যাক্সি কোথাও নেই।

ঝাড়া এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর এক গলির মোড়ে ট্যাক্সির সন্ধান পাওয়া গেল। ড্রাইভার সহৃদয়, তবে চেহারায় মালুম ট্যাক্সিখানা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে উল্টার ডেন লিণ্ডেন—সোজা ঠেকেছে ব্রাণ্ডেনবুর্গ ফটকের পায়, এপাশে ওপাশে কড়া পাহারা। ঐ তো পরিষ্কার দেখা যায় পশ্চিম বার্লিনের চওড়া রাস্তা, হরিণ কানন, রাইষ স্টাগ, গাড়ির মিছিল। মাত্র দু'দিন আগে ওপার থেকে দেখেছিলুম ঐ একই জায়গার চেহারা, দেখেছিলুম দূর থেকে পূর্ব বার্লিনকে।

আর আজ? দুদিন আগে ফেলে আসা আমি আর আমার জগৎকে নতুন এক আমি দেখছি। দৃষ্টিভঙ্গীতে কত তফাৎ। মোটর হাঁকিয়ে নিজে যখন ছুটি, পথচারীদের করুণার দৃষ্টিতে দেখি। আবার পরমুহূর্তে পথচারী সেজে দ্রুত ধাবমান অন্য মোটর গাড়ির দিকে সেই আমিই ঈর্ষার কটাক্ষ হানি। দুই সত্তায় কত তফাৎ।

এও অনেকটা তেমনি। আমি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক, আমার দৃষ্টিতে দুই-ই সমান। কিন্তু জানি না, বার্লিনের পটভূমিকায় ঐ দুই আমি সত্যি সত্যি সমান কিনা।

রুশ দূতাবাস এবং বহু মনীষীর স্মৃতিপূত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে স্তালিন আলে,—থুড়ি কার্ল মার্ক্স আলে এবং ফ্রাংকফুটার আলে। রাস্তাটির নতুন নামকরণ হয়েছে। এই একমাত্র রাস্তা পেলুম, যেখানে গাড়ি ঘোড়া লোকজনের কিছু আনাগোনা নজরে পড়ে। ড্রাইভার জানাল, এই তো এই জায়গায় কিছুদিন আগে স্তালিনের মূর্তি ছিল। এখন স্তালিন 'কাপুত'—অর্থাৎ কিনা 'খতম'।

খানিক ঘুরে আবার সেই তৃষিত মরুভূমির চেহারা। মিলিটারি গাড়ি দু'চারখানা দেখা যায়, লোকজন কোথাও না। আর এখানে নয়, ড্রাইভার, চল ওআর মেমোরিয়েলে।

হাঁ, ওআর মেমোরিয়েল দেখার মত জায়গা বটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত রুশ সৈন্যের স্মৃতিতে তৈরি হয়েছে এই পবিত্র তীর্থভূমি। দেখলুম, পপলার আর ফার গাছের বীথি দিয়ে শত শত লোক লোক চলেছে শহীদ স্মৃতি বেদীতে মাল্যার্ঘ্য নিবেদন করতে। ছেলে-বুড়ো, তরুণ-তরুণী সবাই। এবং এরা গত মহাযুদ্ধে রুশ সৈন্যের কাছে পরাজিত পূব দেশের অধিবাসী জার্মান।

বিরাট চত্বর জুড়ে শ্বেতপাথরের গায়ে খোদাই করা মহাযুদ্ধের ছবি এবং রুশী ও জার্মান ভাষায় 'মহামতি' স্তালিনের বাণী। এই ওআর মেমোরিয়েলের প্রস্তর ফলক থেকে স্তালিন তখনও উচ্ছেদ হননি।

দু'পা এগোলেই ব্রোঞ্জের ওপর খোদাই করা এক দীর্ঘকায় সুবিশাল মূর্তি। মাদার রাশিয়া। তার এক হাতে শিশু, অন্য হাতে তরবারি। বরাভয় দিয়ে সে শিশুকে আঁকড়ে ধরেছে, তরবারি দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলেছে নাৎসী জার্মানির প্রতীক স্বস্তিকাকে। মূর্তির ভারী বুটের আঘাতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে ঐ একই স্বস্তিকা।

শিল্পীর অপূর্ব ভাস্কর্যকলা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। তেমনি স্তম্ভিত হতে হয় পূর্ব জার্মানির নাগরিকদের দলে দলে এই স্মৃতি বেদীতে আসার আগ্রহ দেখে। কিন্তু আমি জানতে চাই, এই যাদের আজ দেখছি তারা কি নিজের মনের তাগিদেই এখানে ফুল ছড়িয়ে দিতে এসেছে?

ইংরেজী অল্প স্বল্প জানেন, এমন একজনকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করলুম, আজ এত ভিড় কেন, এখানে কিসের উৎসব?

ভদ্রলোক বললেন, আজ মুক্তির দিন।

কিসের মুক্তি, কার হাত থেকে মুক্তি?

ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, আজ এই তারিখেই জার্মানি আত্মসমর্পণ করে, নাৎসিবাদের হাত থেকে এই দিনটিতে আমরা

মুক্তি পাই।

ভদ্রলোকের কথা যদি আন্তরিক হয়, যদি তোতা পাখির বুলি না হয়, তাহলে বলব, পূর্ব জার্মানির নতুন জন্ম হয়েছে। অতীতকে অস্বীকার করে আর এক বিশ্বাসকে সে আঁকড়ে ধরেছে।

নাৎসিবাদকে পশ্চিম জার্মানিও তো অস্বীকার করছে, হিটলারের নাম তাদের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলে দিতে চাইছে। তাঁদের অনেকে বলেছেন, হিটলার যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন, পশ্চিম জার্মানি এই সর্বনাশের পুনরাবৃত্তি চায় না। পূর্ব জার্মানির মনের কথাও তাই। তবে কেন টোআইন শ্যাল নেভার মীট ?

দুই বদ্ধ কালার পথে দেখা। একজন আর একজনকে জিগ্‌গেস করলেন, "এই যে শ্যামবাবু, বেড়াতে নাকি ?"

"মোটেই না, মোটেই না। এই একটু ব্রেড়াতে যাচ্ছি"—অন্যজনের উত্তর।

তৎক্ষণাৎ প্রথমজন ফোকলা দাঁত বের করে হাসলেন, বললেন—"ও, তাই বলুন, আমি ভাবলুম আপনি বুঝি বেড়াতে যাচ্ছেন।"

হামবুর্গ শহরে এসে আমিও ঐ জাতের কালা বনে গেছি। যাব এলব্‌টানেল, ট্যাক্সিওয়ালি যা বলেন, আর আমি যা বলি, দুটোয় মিল খুঁজে পাই না। মিনিট পনেরো কথা চালাচালির পর দেখা গেল, এলব্‌টানেল নিয়ে যাবেন কিনা, সেই কথাটাই ফ্রলাইন আমার কাছে জানতে চাইছেন।

দেখুন তো, ভাষা না বোঝার কী মহামুশকিল! এদিকে ট্যাক্সি-মিটার গড়গড় করে দু-দুটো মার্ক (জার্মান মুদ্রা) গ্রাস করে বসে আছে।

যাই হোক, ঝড়ের বেগে এলাম এলব্‌টানেল, এলব্‌ নদীর তলার সুড়ঙ্গে—ছোটোবেলায় পড়া পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যে। এদিক এলব্‌ ওদিক এলব্‌ মধ্যিখানে পথ, তারই ভেতর চলছে মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া-রথ। একেবারে আজব কারবার। লিফট এক নিমেষে নিয়ে গেল পাতালে, তারপরে লম্বা রাস্তা। ওপরে জাহাজ, মাঝি-মাল্লার ভিড় আর তলা দিয়ে আমরা নদীর ওপারে গিয়ে হাজির।

হামবুর্গ শহরে এমনি অনেক আজব জিনিস আছে—তাক লাগানো হাগেনবেক চিড়িয়াখানা, আলস্টার লেক, বিসমার্ক মেমোরিয়াল, ডাকসাইটে শিপইয়ার্ড। হামবুর্গ জার্মানির দু'নম্বর শহর, ইউরোপের পয়লা সারির বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাশী-মক্কা। অনেকটা মিল খুঁজে পাই আমাদের কলকাতার সঙ্গে। সেই ব্যস্ততা, সেই ভিড়,

খিদিরপুর ডকের সঙ্গে আদল, ঢাকুরিয়া লেকের সঙ্গে আলস্টারের মিল। হামবুর্গ বেশি ছিমছাম, এই যা তফাৎ।

হামবুর্গের গৌরব কিন্তু শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে নয়, অন্যখানে। সে 'ফ্রি অ্যাণ্ড হানজেয়াটিক সিটি', বয়স এগারশ বছর। এবং বরাবর সে জার্মানির হয়েও আলাদা—'স্বাধীন শহর'। তার জন্যে আলাদা পার্লামেণ্ট। ১১৮৯ সনের ৭ মে সম্রাট ফ্রেডারিষ বার্বা-রোসা নয়েনবার্গে বসে এক চার্টারে দস্তখত দেন। তাতে তিনি হুকুমনামা দিলেন : The ships and wares of humburg is free from toll from the sea to their town. সেই থেকে হামবুর্গ প্রতি বছর ৭ মে তার জন্মদিন পালন করে।

আমি এলুম তার দুদিন পরে। তবে তখনও তার সারা গায়ে উৎসবের রেশ লেগে আছে। সাদা বকের মত পালতোলা নৌকায় ঠাসা আলস্টার, লম্বার্ড পুল, মার্কিন দেশের ফিফথ্ এভিনিউকে টেক্কা মারা রাস্তা 'য়ুং ফার্ন স্টীগ, সেণ্ট মাইকেল চার্চ, রেপার বাহ্ন, ঘড়ির মুকুট পরা লাল টাউন হল, স্টেট অপেরা হাউস, পোতাশ্রয়—সব মিলিয়ে মনে হল এগারশ বছরের বুড়ো হলে কী হবে, হামবুর্গ ছাব্বিশ বছরের তাগড়া জোয়ানের তাকত রাখে। এবং এখন এসে টের পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমারু বিমানগুলির প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল এই বন্দরী শহর।

অদ্ভুত কর্মশক্তি নিয়ে নতুন জার্মানি গড়ে উঠেছে। লোকগুলো পুরো পাঁচদিন গাধার মত খাটে, দুদিন চুটিয়ে ফুর্তি করে এবং দেশ গড়ার আনন্দে সারাজীবন এখানে ওখানে দাপাদাপি করে বেড়ায়। যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, পরাজিত, অপমানিত হয়েও জার্মানি তুড়ি মেরে তাই এগিয়ে এসেছে। ঘর ছিল না, খাবার ছিল না, টাকাও ছিল না। আর এখন? বেকার নেই, খাবার অঢেল, অন্য দেশকে অর্থ সাহায্য দেয়। এবং শিল্পে বাণিজ্যে ইউরোপের সেরা সে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। তার কারণ? আগেই বলেছি, পরিশ্রমশক্তি। জাতির প্রতি, দেশের প্রতি দরদ তো আছেই, কারিগরি জ্ঞানের

আবার ওয়ান্স আপন আ টাইম এবং সেখানে নাকি জেণ্টলম্যানরা থাকে! এত সংক্ষেপে এত উদ্ভট গল্প আর কেউ বলতে পারে নি হে।

ওদিকে আমরা দুজন হাসতে হাসতে আলস্টার লোকের জল ঘোলা করে ফেলেছি।

গাইড তো নয়, এক একটি সাক্ষাৎ হরিনাথ দে, ফ্রেঞ্চ জার্মান, সোয়েডিশ, ইতালিয়ান গড়গড় বলে যাচ্ছে। তদুপরি সবাই গুলে খেয়েছে বীরবল ও গোপাল ভাঁড়কে। মুখখানা একেবারে রসের গামলা, গড়িয়ে পড়ছে তো পড়ছেই।

এমনি এক গাইডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্যারিসে। কাঁচে মোড়া ট্যুরিস্ট বাস প্লাস দ্য লা মাদলীন থেকে ছাড়তেই মার্কিন দলবলটি গাইডের জবানীতে 'বাফেলো', আমার পাশে বসা ইতালিয়ান সেনোরিতা জিনা এবং সবেধন নীলমণি ইণ্ডিয়ান আমি 'নেহরু'। তখন বিদেশে, আগেই বলেছি, নেহরু মানেই ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়া মানেই নেহরু।

আর 'জিনা'? ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে উঠে এসে এবং হাতের মাইকটি মুখের কাছ থেকে সরিয়ে গাইড বললে, জানো না বুঝি? দান্তে রাফেল সব বরবাদ, ইতালির এখন একমাত্র পরিচয় জিনা লোলোব্রিজিডা। তোমাদের যেমন তাজমহল, লণ্ডনের যেমন বিগবেন, আমাদের ঈফেল চাওয়ার, ইতালির তেমনি জিনা লোলোব্রিজিডা।

বলেই গলা ফাটিয়ে হো-হো হাসি। ইতালিয়ান সঙ্গিনীটিও মুচকি হাসেন। ঠোঁটের ডগা থেকে দু'কদম এগিয়ে নিটোল গালের কাছে আসতে না আসতেই সে হাসি হাওয়া।

গাইড চার পা পিছিয়ে সামনের দিকে খানিক ঝুঁকে গাম্ভীর্যের ভাণ মুখে এনে বলে—'মাননীয় ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, বাসনা ছিল সেইন নদীর পারে লুভর মিউজিয়ামে আপনাদের নিয়ে গিয়ে মোনালিসার ভুবনমোহন হাসিটি দেখাই। এমন ভাবছি তার দরকার নেই, কোণের আসনটিতে বসা 'সেনোরিতাকে' দেখে নিলেই আপনাদের কাজ চলে যাবে, চেয়ে দেখুন একেবারে মোনালিসা স্মাইল।'

আবার একদফা হাসি, মেয়েটি লজ্জায় গোলাপী।

গাইড দু পাশের দ্রষ্টব্যের বর্ণনা দিয়ে চলেছে, "এই হচ্ছে প্লাস দ্য লা কর্কর্দ, এটাই সাঁজেলিজে, সামনে দেখা যাচ্ছে অচেনা সেনার স্মৃতি 'আর্ক দ্য ত্রিয়াফ,' খানিক পরেই ছোট দ্বীপের মাঝখানে নওৎরদাম গির্জে। তার আগে দাঁড়ান, ঈফেল মিনারের কোল ঘেঁসে যাওয়া যাক। আর হ্যাঁ, সুইসাইড করার শখ যদি কারও থাকে বলুন, বাসটা খানিক দাঁড় করাই, মিনারের ডগায় উঠে অনায়াসে ঝাঁপ দিতে পারেন। আমার জানা মতে এ পর্যন্ত ঈফেল মিনার থেকে ঝাঁপিয়ে মোট ৩৬৭ জন শহীদ হয়েছেন। সংখ্যাটা যদি কেউ বাড়াতে চান নামটা বলুন, নোটবুকে টুকে রাখছি।"

মুখ তো নয়, জ্বলন্ত কড়াই, টগবগ খই ফুটছে। আমার ছিল ইংলিশ স্পীকিং বাস। তাই প্রথমে ইংরেজীর ঝড়, তারপর দুটি জার্মান দম্পতির জন্যে জার্মান আর সেই ইতালি-তনয়ার জন্য ইতালিয়ান।

ততক্ষণে ঘুরতে ঘুরতে আমরা অ্যাভালিদ-এ নেপোলিয়ানের কবরের কাছাকাছি এসে গেছি। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই কবরের দোর গোড়ার এক ঢ্যাঙা ভদ্রলোক। গাইড বলে, "দেখ, দেখ, যেন ঈফেল টাওয়ার, গোটা দরজাটা আটকে রেখেছে।"

মজার মজার কথাবার্তা শুনে গাইডটি সম্পর্কে আমার কৌতুহল বেড়ে গেল। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম 'ক'টিভাষা জানেন?'

"চোদ্দটি, এখন জাপানী শিখছি।"

"হিন্দী?"

"ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজ? আদৌ না, তবে শেখার ইচ্ছে আছে।"

আবার বাসে। আবার চক্কর এবং অবিশ্রাম রানিং কমেণ্টারি। পাক্কা চার ঘণ্টা ঘুরপাক খেয়ে যখন বিদায় নেব ভাবছি, এগিয়ে গেলুম গাইডটির কাছে। বললুম, "আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করা যায় বলুন তো?"

"কী দরকার?"—তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেন।

"এই একটু গল্পগুজব করা"—আমার চোখেমুখে বিনয় মোমের মত গলে গলে পড়ছে।

"ঠিক আছে, আসুন ছত্রিশ নম্বর আভেন্যু দ্য লোপেরায়। চারটে নাগাদ, তখন ফ্রি আছি। আচ্ছা, আদিয়ে।"

গাইড চলে যেতেই আমিও ফিরলুম হোটেলে। লাতিন কোয়ার্টারে বিশ্ববিদ্যালয় মহল্লায় রু জাকব নামধারী ছোট রাস্তায়, ততধিক ছোট হোটেল। জার্মান সরকার আর ইংলণ্ডেশ্বরীর ঢালাও আতিথ্যে এত দিন ছিলুম নবাব পুত্তুর। বরাবর খানদানী হোটেল রেস্তোরাঁয় নবাবী করে এসেছি, প্যারিসে এসে গুনতে হচ্ছে গাঁটের ফ্রাঙ্ক। তাই চলছি সাবধানে, গুণে গুণে পা ফেলে।

কিন্তু হোটেল দেখেই মেজাজ তিরিক্ষি। লিফট নেই, লাগোয়া বাথরুম নেই, গড়ের মাঠ লাউঞ্জ নেই, বিছানার কাছে টেলিফোন পর্যন্ত নেই। আর বিছানাটিও মাখনের ডেলা নয়, চাদর কুঁচকে আছে।

তৎক্ষণাৎ ভুরুটাও কুঁচকে গেল। বেড-ব্রেকফাস্টে হর রাত তেইশ নয়া ফ্রাঙ্ক গুণেও এই হাল! ধুৎতেরি।

ঘণ্টি টিপেই বা কী লাভ। বুড়ি ঝি ছুটে এসে 'উয়ি মঁসিয়ে এবং 'মের্সি মঁসিয়ে'র ফোড়ন দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন ছাইপাশ বলে যাবে ঠাওরই করতে পারব না। এমন 'অশিক্ষিত' জায়গা, ইংরেজী পর্যন্ত বলতে পারে না।

গটমট করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম। হাতে দু'ঘণ্টা সময়। ঘুরতে ঘুরতে সময় কাবার করে চারটেয় যাওয়া যাবে গাইডের দেওয়া ঠিকানায়। আগে ভেবেছিলুম অমিত রায় কে টি মিত্তিরের মুখে শোনা 'মনামি' আর সদ্যোলব্ধ 'আশাঁতে' শব্দ দুটি সম্বল করে কোন ফরাসিনীর সঙ্গে ভাব জমাব, এসে দেখছি, সে 'কেকে' বালি! আমার ফরাসী ওদের কাছে 'গ্রীক' এবং জিনিসপত্র খাবার দাবারের যা পিলেকাঁপানো দর, ফুর্তিফার্তির দুরাশা শিকেয় তুলে তার চেয়ে ঢের ভাল সেই গাইডের সঙ্গে আড্ডা মারা।

রু বোনাপার্ত উজিয়ে এক ফার্লং এগোলেই সেইন নদী। পঁ রইয়াল

ধরে নদী পেরোতেই লুভ্‌রের বিরাট আঙিনা। তার তলায় খানিক উঁকিঝুঁকি মেরে রু ছ্য রিভোলি। সেখান থেকে তেরচা হয়ে বেরিয়েছে অ্যাভন্যু ছ্য লোপেরা। মোড়েই ছত্রিশ নম্বর বাড়ি, সেই বাড়িই লাফি তুরিজম। আমার সেই গাইডের অফিস।

দেখি বিরাট সোফায় গা এলিয়ে উত্তর-পঞ্চাশ ছোটখাট মানুষটি সিগারেট মুখে বসে আছেন! অফিসে আর কেউ নেই। ঢুকতেই সোফা থেকে শোনা গেল,—"এই যে, নেহরু এসে গেছ!"

পাশের সোফায় বসতে বসতে জিগ্‌গেস করলুম—"মহাশয়ের নামটি তো জানা হয়নি।"

"মায়েরোভিচ্। সবাই ডাকে 'লিটল জ্যাকি'।"

"নামটাতো র‍্যাশ্যান র‍্যাশ্যান মনে হচ্ছে।"

"না, আমার বাড়ি ছিল পোল্যাণ্ড।"

"এখানে কী করে?"

"সে এক ইতিহাস। অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে এখানে টিঁকে গেলুম। প্যারিসের প্রত্যেকটি রাস্তাই যে এক এক ভল্যুম ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিলুম।"

লিটল জ্যাকি থামতেই আমি বলি, "গোড়া থেকে শুরু হোক"। গাইড নড়েচড়ে বসলেন। আমার দেওয়া ফিলটার সিগারেটটি লাইটারে ধরিয়ে বললেন,—"এই টেলিভিশনটাই আমার সর্বনাশ করে দিলে"।

"তার মানে?"

"মানে আবার কী হবে, ছিলুম শো বিজনেসে, গড়াতে গড়াতে হয়ে গেলুম ট্যুরিস্ট গাইড।"

"অর্থাৎ?"

"দাঁড়াও, বলছি। ১৯২০ সালে এসেছি প্যারিসে, তখন আমার বয়স বারো। ততদিনে 'আই এম অলরেডি ফানী'। ছোটবেলায় মা বাবা হারিয়ে ওয়ারশ থেকে পালিয়ে এলুম। যোগ দিলুম এক অর্কেস্ট্রা পার্টিতে। তারপর দশ বছর পুরতে না পুরতেই নিজের শো বিজনেস

নাম হল 'লিটল জ্যাকি ব্যাণ্ড অ্যাণ্ড হিজ বয়েজ'। তখন থেকে আমার পরিচয় লিটল জ্যাকি। স্টেজে হাসি ঠাট্টা ভাঁড়ামি করি, রাতের পর রাত হাততালি কুড়াই। ডাক পড়ে নানা দেশ থেকে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগেয়ে, ভেনজুয়েলা, মেক্সিকো, মার্কিন দেশ ঘুরে ফের প্যারিস। ততদিনে বিখ্যাত লোক। লিটল জ্যাকি বলতে সবাই পাগল। ১৯৩৭ সালে গেলুম লণ্ডন। সেখানে আর এক দফা জনপ্রিয়তা। সিনেমায়ও কমিক রোলে নামলুম। তারপর লাগল যুদ্ধ। 'পোলিশ' বলে নিয়ে গেল কনসেনট্রাশন ক্যাম্পে—জার্মানির 'ডাহাউ' নামে জায়গায়। ক্যাম্প থেকে পালিয়ে সোজা সোয়েডেন। গা ঢাকা দিয়েছিলুম অনেক দিন। যুদ্ধ থামলে পর আবার 'আউট অব নাথিং' সবাইকে হাসাতে শুরু করেছি। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে ব্যবসা জমে উঠল। সেখানে কয়েক বছর কাটিয়ে পুরো চার বছর জার্মানিতে। ততদিনে চোদ্দটি ভাষাও শিখে ফেলেছি।

"আচ্ছা, এতদিন তো ঘুরলেন, আপনার মতে কোন দেশ সবচেয়ে ভাল হিউমার বোঝে?"—আমি প্রশ্ন করি?

"হিউমার"?—লিটল জ্যাকি জবাব দেন—"আমার ধারনা, ডেনমার্ক, তারপর ইংল্যাণ্ড।"

"ফরাসীরা"?

"আরে দূর দূর, ডেন-দের কাছে কেউ না। হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আমার কপাল পুড়ল তিন বছর আগে, ১৯৫৯ সালে। দলের ম্যানেজার একদিন এসে বললে—ব্যবসা বন্ধ করে দেব, আর চলছে না। টেলিভিশনের বাজার এখন। শো বিজনেসের দিন নেই। পড়লুম অকূল পাথারে। বুড়োও হয়ে যাচ্ছি। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। তখনই এক বন্ধু এসে বললে, 'লাফি'তে যোগ দাও, টাকা পাবে। জিগ্‌গেস করলুম কী কাজ? বললে, অনেক ভাষা জানোতো, তাই গাইডের কাজ। মা মেরী বলে ঝুলে পড়লুম। এখন বেশ আছি, তোমাদের মত বোকা বিদেশীদের চরিয়ে দু'পয়সা কামাই।"

"এ কাজ ভাল লাগে ?" ফের প্রশ্ন।

"মোটেই না, আমার মন পড়ে আছে শো বিজনেসে। গতকাল রাত্রে একদল ট্যুরিস্ট নিয়ে গিয়েছিলুম মুল্যাঁরুজে। স্টেজে একটি লোক হাসাচ্ছিল। ছোকরা কায়দা ভালই জানে। কিন্তু কী বলব, আমার তখন ভীষণ কান্না পাচ্ছে! আমারও তা ঠিক ঐ ভাবে স্টেজে দাঁড়ানের কথা ছিল—"

লিটল জাকি হঠাৎ থেমে গেলেন। মিনিট দুই পরে বলেন, "যাক্‌গে ওসব কথা, যাবে নাকি আজ মুল্যাঁ রুজে ? আমিই দল নিয়ে যাব।"

ক্লোটেন এয়ার পোর্ট থেকে সোজা টার্মিনালে এসে চেহারা ছবি দেখে মনে হল ফের জার্মানিতে পা দিয়েছি। 'রোড', 'স্ট্রীটের' বদলে ফের 'ষ্ট্রাসে', ফের, 'প্লাৎস্'। পথে বেরোলে আবার সেই বিজ্ঞপ্তি— 'আইন গাং' (বের হবার পথ), 'উমলাইটুং' (ঘুরে এস), 'আইন-বাহ্ন ষ্ট্রাসে' (একমুখী রাস্তা)। লোকজনের চেহারাও গাট্টাগোট্টা, গাব্দাগোব্দা। ভাষায় সেই জার্মান খটমটী। তফাৎ গলার মোলায়েমী ঢঙে। অর্থাৎ 'ওটেন টাগের' বদলে 'ওতেন তাগ', 'ডাস বোডেনের' জায়গায় 'দাস বোদেন'।

এদিকটা জার্মানভাষী। জেনিভার দিকে ফরাসী চল, লুগানোর দিকে ইতালিয়ান। কুলীন ব্রাহ্মণের গাদা গাদা বউয়ের মত সুইজারল্যাণ্ড তিন তিনটে ভাষা সামাল দিচ্ছে।

কখনো কখনো শোনা যায় দুটি ভাষার জগাখিচুড়ি। ট্রেনে চলেছি বাজেল—ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ডের ত্রিবেণী সঙ্গমে, টিকিট চেকার কামরায় ঢুকে বলল,—'গুতেন মর্গেন', বিদায় নেবার সময় জানাল,— 'আদিয়ে'।

অনেক সময় আরও মেশাল। জার্মান 'ডাংকেশ্যোন' আর ফরাসী 'মের্সিবুকু' মিলিয়ে কোন কোন সুইস বলে 'ডাংকেবুকু'। আমাদের বাংলা ভাষার 'হেড-মৌলবী' 'বুক পকেটের' চেয়ে এক কাঠি বাড়া।

প্যারিস থেকে এসেছি জুরিখ—সুইজারল্যাণ্ডের সেরা শহর, টুরিস্টদের কাশী-মক্কা। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে সারি সারি বাড়ি। দু'পা উঠে তিন পা নামতে হয়। শহরের বুক চিরে এঁকেবেঁকে গিয়েছে লিমাট নদী। এক পাশে পেল্লাই লেক। ঐ সবুজ পাহাড়ের চূড়ো থেকে লেকের নীল জলে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেও বুঝি আরাম। আর স্পীডবোট ভাড়া করে কোন সঙ্গিনী নিয়ে যদি জুরিখ লেকে চক্কর মারি, তাহলে তো কথাই নেই, বুকে স্রেফ এক খানা দেড় গজী প্রেমের চাকু।

লেকের পারেই ওরা সব অপেক্ষা করছিল। বাহনহোফ্ ষ্ট্রাসে

বরাবর এগিয়ে ব্যকলি প্লাৎস। বাঁয়ে মোড় ঘুরে জুরিখের চৌরঙ্গি, 'বেলেভ্যু'। আরও ছ'কদম সামনে বিরাট পার্ক। সেখানেই সূর্যঘড়ির পাশের বেঞ্চিতে নরক গুলজার। কে বলবে সুইজারল্যাণ্ড, যেন কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকের পারে আড্ডা বসেছে। জেনিভা, লুৎসার্ন, বাজেল ঘুরে আড্ডায় আমিও সেদিন হাজির।

দলের সবাই বাঙালী। সবাই ইঞ্জিনিয়ার। ঘোষ, বিশ্বাস, রায়চৌধুরী, সেনগুপ্ত, চৌধুরী, মিত্তির। কেউ কাজ করে ব্রাউন বোভারিতে, কেউ স্পেখার উণ্ড শুতে। বাডেন, বুখ্স্, আরাউ, রাইদেন, সব জায়গা থেকে ঝেঁটিয়ে এসে মিলেছে।

দল বেঁধে যাব রাপার্সভিল। ছোট্ট স্টিমারে। ঘোষ বললে, "সান্যাল, যাও তো স্টিমার ছাড়ার সময়টা জেনে এসো তো।"

"না বাবা, আমি যাচ্ছিনে, মি-মি—মিত্তিরকে পাঠাও",—সান্যালের সাফ জবাব।

সান্যাল একটু তোৎলা। কথা বলতে গেলেই জিভ আটকে যায়। শুনেছি, লিখতে গেলেও সে তোৎলামি করে, ত'-এর ফুটকিতে নিব ঘোরে।

"সান্যালের কাণ্ড জানো না বুঝি"—প্রবীর ঘোষ টাকে ছবার হাত বুলিয়ে বলে—"মাস ছুই আগে ওলটেন বাহনহোফে—থুড়ি রেল স্টেশনে ও গার্ডকে ধরে মেরেছিল আর একটু হ'লে। আমরা তখন নতুন এসেছি। সান্যালও নতুন। অনেক কষ্টে খুঁজে পেলুম ইংরেজী জানা গার্ড। লুৎসার্ন যাব, তার ট্রেন কতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়াবে জানতে সান্যালই এগিয়ে গেল, 'হা-হা-হা-উ' ইত্যাদি হাউমাউ করে বোঝাল ব্যাপারটা। গার্ড বললে—টু-টু-টু, টু টু-টু।"

সান্যাল রেগে কাঁই, চোখ মুখ পাকিয়ে বলে—"ভ্যাংচাচ্ছেন কেন মশাই?"

গার্ড আবার বললে,—"ঠিকই তো বলেছি তো বলেছি টু-টু-টু টু টু-টু।" বলেই চলে গেল। সান্যাল তখনও গজরাচ্ছে—'তোৎলা বলে আমাকে ভ্যাংচাবে?"

"ভেংচাল কোথায় ?"—আমি হাসতে হাসতে সান্ত্বনা দিই—"ঠিকই তো বলেছে। বলেছে গাড়ি থামবে দুটো বাজতে দুমিনিট থেকে দুটো দুই পর্যন্ত।"

সকলের উচ্ছ্বসিত হাসির মাঝখানে সান্যালের গলা শোনা যায়—য-য-য-য। অর্থাৎ কিনা, 'যত সব বাজে কথা, আমার ঘাড়ে অন্যের গল্প চাপাচ্ছ।'

বিশ্বাস বলে—ওই হল, তুমি আমাদের বলদেব সিং।

স্টিমার ছুটেছে রাপার্সফিলের দিকে। ডেক ভর্তি টুরিস্ট, বেশিরভাগ মার্কিনী। কাঁধে ক্যামেরা, চোখে বাইনাকুলার, পকেটে নোটবুক। এপার ওপার রোজ যাতায়াত করে এমন কিছু সুইস ডেলি প্যাসেঞ্জারও রয়েছে।

দাঁড়ের ঘায়ে লেকের জল ছলাৎ ছল। দু'পাশে ছোট ছোট শহর, গাঁ। পাড়ে কেউ বসেছে মাছ ধরতে, কেউ বান্ধবীকে বগলদাবা করে বসে আছে জলে পা ডুবিয়ে। জুরিখ শহর ক্রমে দূর, ক্রমে ঝাপসা। পেছনে ফিরলে ঐ উঁচুতে দেখা যায় ড্যাবড্যাব চোখে তাকিয়ে আছে অভিজাত হোটেল 'দল্‌দার'।

এদিকে আমরা এককোণে বঙ্গভাষায় কলধ্বনি চালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে পেয়ে ওরা সবাই ক্ষুধার্ত হায়েনা। দেশের খবর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। "বৃষ্টি পড়লে কলকাতার রাস্তায় এখনও জল জমে ?" —"বিধান রায়ের পর চীফ্‌ মিনিস্টার কে হবেন ?"—"আচ্ছা, দেশে ফিরলে চাকরিবাকরি মিলবে তো"—"দূরছাই, আর ভাল লাগে না, আপনার সঙ্গে চলেই যাই।"

সেনগুপ্ত তৎক্ষণাৎ ফোড়ন কাটে—"ব্যানার্জি, খুব তো বলছ চলে যাবে, এনিটারাণীর তা'হলে কী উপায় ? নাকি দুজনেই—"

সেনগুপ্তর কথা শেষ হতে না হতেই অন্য কোণ থেকে হঠাৎ গানের আওয়াজ :—কালকুট্টা লীগট্ আম্ গাঙ্গেস, পারী আম সেইন—।

এদিককার একটি জনপ্রিয় গান। কলকাতাইদের দেখেই বোধহয় সুইস মেয়েগুলোর রস উথলে পড়েছে। রেলিং ধরে কোরাস ধরেছে,

আর আড়চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসছে। গানটির পদ কিন্তু চমৎকার—"গঙ্গানদীর পারে শহর কলকাতা, সেইনের পারে প্যারিস।"

আমরাই বা তাহলে পিছনে পড়ে কেন? দলের একমাত্র বঙ্গললনা, নামকরা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ঘোষজায়াকে বললুম—'ধর না তুমিও।'

বনানী সারাক্ষণ অন্যান্য যাত্রীদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে। কেননা, তার পরনে শাড়ি। শাড়িপরা মেয়ে পথে-ঘাটে দেখলে এখানকার লোকেরা তিনবার হুঁচট খায়, পাঁচবার ঢোঁক গেলে।

স্টিমার একটি স্টেশনে থেমে আবার চলেছে। আমার কথায় সবাই সায় দিলে।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান হোক। 'রবীন্দ্র-সংগীত।'

বনানী খানিক আমতা আমতা করে গান ধরতে যাবে, হঠাৎ মনোজ চৌধুরীর হেঁড়ে গলা—"আকাশে বিজলি হানা, বুক হইল মোর ফানা ফানা, বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া নিল রে—"

"কর কী, কর কী"—মিত্তির চেঁচিয়ে উঠল—"ওসব কী অশ্লীল কথা চালাচ্ছ, সঙ্গে ভদ্রমহিলা আছেন না?"

চৌধুরী গান থামিয়ে পাল্‌টা জবাব দেয়, বাঃ রে, অশ্লীলটা কোথায় হল? উত্তরবঙ্গের কোন অখ্যাত পল্লী-কবি লিখলেই অশ্লীল, আর তোমাদের রবিঠাকুর যখন লেখেন, "বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে ঐ প্রভাতখানি"—তখন তো সবাই আহ্লাদে আটখানা। যত দোষ নন্দঘোষেরই।"

অকাট্য যুক্তি। চৌধুরীকে বাদ দিয়ে আমরা তখন বনানীকে গান গাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করেছি। বনানী গাইবে কি গাইবে না, ভাবছে, এমন সময় মিত্তির বলে—'তাহলে টেপরেকর্ডার বাজাই।'

মিত্তির টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এখানে যে ক'জন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সবারই আছে একটি ক'রে। নির্মলেন্দু চৌধুরী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্রের গানে বোঝাই। কেউ কেউ আবার পুরো 'শ্যামা', পুরো 'চিত্রাঙ্গদা' রেকর্ড ক'রে রেখেছে। একজন দেশ থেকে এনেছে, অন্যরা তা থেকে তুলেছে।

মিস্ত্রির টেপরেকর্ডারের চাবি প্রায় খুলতে বসেছিল। আমি আপত্তি করি—"না, ওসব রেকর্ডফেকর্ড নয়, সোজাসুজি খালি গলার গান। এমন গাইয়ে সঙ্গে রয়েছে টেপ-রেকর্ডারের কী দরকার?"

"খুব তো বলছেন, টেপরেকর্ডারের কী দরকার, জানলে বলতেন না"—প্রবীর ঘোষ আবার টাকে হাত বুলিয়ে বলে—"গত মাসে ছিল বিশ্বাসের বিয়ে, আরাউয়ের গ্রেটলির সঙ্গে পুরোদস্তুর হিন্দু মতে, হোটেল হেলভেশিয়ার একটি ঘর ভাড়া করে সব ব্যবস্থা করলুম। তেলসিঁদুর, ধানদুর্বো, কলাপাতা, মঙ্গলঘট—সব। চার হাত উঁচু বালি বিছিয়ে হোমেরও ব্যবস্থা হল। কিন্তু পুরুত? তাকে কোথায় পাই? পুরুত না পেলে তো সব আয়োজন মাটি। ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করলুম, বিয়ের মন্ত্রটন্ত্র জানে কিনা, সে হেসে উড়িয়ে দিলে।

মহা ফ্যাসাদ। শেষমেষ জানা গেল জেনিভাতে রামকৃষ্ণমিশনের এক স্বামীজি আছেন, তিনি হয়ত কাজ চালাতে পারবেন। ট্রাংককল করা হল। স্বামীজি জানালেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। একে অব্রাহ্মণ, তদুপরি মাদ্রাজী। মন্ত্র মিলবে না। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি বললেন, জেনিভার ভারতীয় দূতাবাসে 'ঘটক' বলে এক ভদ্রলোক আছেন তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

ফের ট্রাংক-কল। ঘটক হেসে বলেন—'না মশাই, পারব না। 'ঘটক' পদবী বলে বিয়ের সব কিছুই আমি জানব নাকি?

আমরা বিশ্বাসের বন্ধুরা পড়লুম অথৈ জলে। এমন কী করা যায়? হঠাৎ খবর পেলুম বোসের। বোস বাডেনে থাকে, কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। সে নাকি দেশ থেকে বিয়ের মন্ত্রের একটি স্পুল টেপ-রেকর্ড করে আনিয়েছে। ব্যস, কেল্লা ফতে! বাডেন থেকে আনা হল সেই স্পুল। হোটেল হেলভেশিয়ার ঘরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বিশ্বাস এবং শাড়ি-ব্লাউজ পরা গ্রেটলি বসল হোমের আগুনের সামনে। রুবি, মানে আমার ওয়াইফ বনানী ধান-দুর্বো দিয়ে করলে আশীর্বাদ, আমি শাঁখের বদলে বাজালুম বিউগল, আর টেপ-রেকর্ডে বাজতে লাগল—'যদিদং হৃদয়ং মম'—ইত্যাদি। ভালয় ভালয় বিয়েটা চুকে গেল।

এই টেপ-রেকর্ডার না থাকলে বিশ্বাস হয়ত বিবাগীই হয়ে যেত !"

প্রবীর থামতেই আমি বলি—"হ্যাঁ ; বিয়ের মত বিয়ে বটে, এমনটি আর শুনিনি। তবে আর নয়, এবারে গান।"

বলতে না বলতে গান শুরু। 'আমার দিন ফুরাল ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।'—সন্ধ্যার জুরিখ-লেক, এলোমেলো বাদল হাওয়া আর সহযাত্রী সব বিদেশীকে চমকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি কলি।—'কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে, তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে—'

সব স্তব্ধ। লেকের জল, স্টিমারের যাত্রী, দূরের আকাশ।

আমরা ততক্ষণে কেউ আর এখানে নেই। আল্পস, ভূমধ্যসাগর সাহারা মরুভূমি ডিঙিয়ে মনপবন উধাও হয়েছে দূরে। হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে,—সুপারি-নারিকেল-তাল-তমাল-কলাগাছে ছাওয়া, বাদল অন্ধকারে ঢাকা এক আশ্চর্য জগতে, বঙ্গভূমে।

সিনেমা-লাইন

সিনেমা-লাইনের একটা দিক আমি একবার চাক্ষুষ দেখে এসেছি। অনেকটা জেনেও এসেছি। ভয়ে আর ভিড়িনি। তবে আগেই বলে রাখি, ভাল অন্য দিকও অবশ্য আছে!

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। ১৯৫০ সাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। একদিন বসে আছি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের অফিসে। হঠাৎ মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এসে হাজির. ইউনিয়নের সভাপতি আমাদের বন্ধু মনোজ বড়ুয়াকে ভদ্রলোক বললেন—আমি টালিগঞ্জ থেকে আসছি। সিনেমার সঙ্গে আছি, একটি গল্প তুলছি, তার নায়ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। নায়িকা শান্তিনিকেতন থেকে বি. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। এই গল্পের ব্যাপারে আপনাদের একটু সাহায্য চাই, হেঁ হেঁ।

সিনেমা পাড়ার লোক, তদুপরি সাহায্য প্রার্থনা. আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ আগ্রহী। মনোজ বললে,—ঠিক আছে, কিছু ভাববেন না, আমরা সাহায্য করব। তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফের বললে—এঁকে নিয়ে যান, শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বিশ্বভারতী কলকাতা, দুই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নাড়ি নক্ষত্র জানে।

ভদ্রলোক আমাকে বঁড়শিতে গেঁথে তুললেন এবং খানিক বাদেই সিনেমা পাড়া টালিগঞ্জের ইন্দ্রলোক স্টুডিওতে আমি উৎক্ষিপ্ত।

ইন্দ্রলোক স্টুডিও টালিগঞ্জের প্রায় শেষ প্রান্তে। এখন বন্ধ। এই স্টুডিওতেই আমার জীবনের কয়েকটি অদ্ভুত দিন কেটেছে। বলতে দ্বিধা নেই, আমি হাতে আশমান পেয়েছিলুন সেদিন! রূপকথার জগৎ সিনেমার সঙ্গে এত অল্প বয়সে যোগাযোগ হওয়া যে বরাতের কথা।

যাই হোক, ভদ্রলোকটি আমাকে স্টুডিওতে অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন,—ইনি পরিচালক, হেঁ-হেঁ, ইনি ক্যামেরাম্যান

হেঁ-হেঁ, ইনি এই যাকে বলে ফিনান্সিয়ার, আর হেঁ-হেঁ অমুক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধরে এনেছি, হেঁ হেঁ, একখানা জুয়েল, ইনিই আমাদের অধিনায়কের গল্প লিখবেন।

ভদ্রলোক বলেন কী! আমি তো স্রেফ পরামর্শ দিতে এসেছি, গল্প লিখব কেন? সিনেমার গল্প লেখার কী-ই বা জানি আমি!

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার মনের অবস্থা আন্দাজ করেছিলেন। কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন,—কিচ্ছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব। কাল সকালে আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসব। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

পরদিন আমাকে সত্যি সত্যিই গাড়িতে তুলে নিয়ে এলেন। পথে গল্পের কাঠামোটাও বলে দিলেন। নায়কের নাম প্রলয়—ছাত্র ও সমাজসেবী। নায়িকা শম্পা—ছাত্রী ও বড়লোকের অর্থাৎ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মেয়ে। শম্পা পম্পা চম্পা তিন বোন। গল্পে একটি ট্রেন দুর্ঘটনা থাকবে। বস্তি থাকবে গ্রেটইস্টার্নে একটি পার্টি থাকবে। একজন চতুর মারোয়াড়ী থাকবে এবং বলা বাহুল্য নায়ক-নায়িকার প্রেম থাকবে। বাপ বিয়ে দিবে না, তবু মেয়ে গরিবের ছেলেকে বিয়ে করবেই ইত্যাদি। ব্যস, আর দরকার নেই, ওই নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলুন। আপনার চেহারা দেখেই চিনেছি আপনি পারবেন। আর হ্যাঁ, চিত্রনাট্যও আপনাকে তৈরি করতে হবে। নানা, কিচ্ছু ভাববেন না, ডিরেক্টার আপনাকে হেলপ করবে।

আমি ততক্ষণে সেয়ানা হয়ে গেছি, বললুম—ঠিক আছে, আমি পারব। স্টুডিওতে আমার জন্য আলদা একটি ঘরের ব্যবস্থা হল। আমি সেখানেই গিয়ে বসলুম। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কাগজের দিস্তে, কালি কলম, বেয়ারা। পাকা বন্দোবস্ত।

খানিক বাদেই ডিরেক্টার হাজার। স্টুডিওতে তখন আর একটি বইয়ের সুটিং চলছে। নাম 'মুখোশ'।

'অধিনায়ক' এবং 'মুখোশ' দু' বইয়ের একই ডিরেক্টার। ডিরেক্টার আমাকে ওয়াইপ, মিক্স, মন্তাজ, ফেড ইন, ফেড আউট ইত্যাদি শাস্ত্র

বাক্য ভাল করে বুঝিয়ে তাঁর নানা রকম আইডিয়া আমাকে গলাধঃকরণ করালেন এবং তারপর মাথায় দিলেন হাতুড়ির ঘা। তিনি বললেন—শুটিং শুরু হবে ৮ই, আজ ২রা এই ক'দিনে আপনি লাস্ট সিনের ডায়লগগুলো তৈরি করে ফেলুন।

সর্বনাশ, এখন উপায়? ডিরেক্টার অভয় দিলেন, আমি বলে বলে যাব, আপনি শুধু গুছিয়ে লিখে ফেলবেন।

কিন্তু স্টোরিই যে লেখা হয়নি।

তার দরকার নেই, শুটিং আর গল্প লেখা এক সঙ্গেই চলবে। যা বলছি শুনুন, লাস্ট সীনের সেট তৈরির হুকুম হয়ে গেছে। একটি জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা বাড়ি, নায়ক প্রলয় শেষ বক্তৃতা দিয়ে চলে যাচ্ছে আর ফিরে আসবে না।

কোথায় চলে যাচ্ছে?

তার ঠিক নেই। দরকারও নেই। একটু স্থির হয়ে বসুন, আপনাকে পুরো গল্প বুঝিয়ে দিচ্ছি।

পুরো তিন ঘণ্টার ধস্তাধস্তিতে আমি সব কায়দা কানুন জেনে নিলুম। ডিরেক্টার ভদ্রলোকটি সদাশয় এবং অমায়িক। বললেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই, আমাদের এমনিই হয়ে থাকে। এদিকে আমি ইউনিভার্সিটির ক্লাস কামাই করতে শুরু করে দিলুম। রোজ সকালে স্টুডিওর গাড়ি বাড়ি আসে, গটগট করে চলে যাই। স্টুডিওতেই ফ্রি খাওয়া দাওয়া। ফিরি রাত ন'টায়। প্রথম দিনের সেই ভদ্রলোক—পরে জেনেছি তিনি প্রডিউসার—ঘন ঘন আমার ঘরে আসেন, নানরকম লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন এবং নিজের থেকেই একদিন বললেন, দু হাজার টাকা আপনি পাবেন। চুক্তিটা সই হলেই অর্ধেক পেয়ে যাবেন। বাকি আদ্ধেক পাবেন মাস দুই পরে। ১৯৫০ সালে ছাত্র অবস্থায় দু'হাজার টাকা! আমি মনে মনে চঞ্চল হয়ে পড়ি। মুখে বলি, ঠিক আছে। টাকার জন্য ভাববেন না।

সে আমি জানি, ভদ্রলোক মুখটিপে হেসে বললেন, এবং জানি বলেই তো আপনাকে নিয়ে এসেছি।

একদিন শুভ মহরৎ হয়ে গেল। আমি ঝেঁটিয়ে সব বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গেলুম। ওদের না দেখাতে পারলে সিনেমা লাইনে এসে লাভ কী! মহরতের ছবি তোলা হল। শুনলাম গুরুদাস ব্যানার্জি নায়কের পার্ট করবেন। তিনি এসেছেন, আর এসেছেন মেয়ে কয়েকজন। পদ্মা দেবী, প্রণতি ঘোষ, কবিতা সরকার স্বাগতা চক্রবর্তী, ইত্যাদি। 'ছিন্নমূলের' নায়ক প্রেমতোষ রায়ও হাজির। এইসব তারকাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে সবার সঙ্গে কথা বলে আমার তো একেবারে 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা' ভাব। এদিকে আনন্দ বাজার, যুগান্তর, বসুমতী, অমৃত বাজার, সব কাগজে 'প্রস্তুতির পথে অধিনায়ক' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তি ঘটা করে প্রচারিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে কাহিনীকার হিসাবে নিজের নাম দেখে আনন্দে মূচ্ছা যাই আর কি! বন্ধু বান্ধবদের ভিতরও খাতির বেড়ে গেছে রাতারাতি। হিংসেও করছে দু'চারজন। কেউ বলে 'লাকি চ্যাপ', কেউ বলে 'শাবাস'। ক্লাসে বা কফিহাউসে পেলে সবাই ছেঁকে ধরে। দু' একজন আবার বাড়ি এসে চড়াও হয়। 'দে না ভাই একটা চান্স, দেখিস, অভিনয়ে ফাটিয়ে দেব'। কাউকে নিরাশ করি না, বলি, অমুক সময়ে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে দেখা করিস।

শান্তিনিকেতন চলে গেলুম একদিন ছুটি নিয়ে। আমার পুরানো জায়গার প্রতিক্রিয়াটিও তো দেখা চাই। সেখানে পেলুম জোর খাতির।

'কীরে অসিত, সিনেমটা দারুন বাগিয়েছিস তো?'- 'অসিতদা আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন না!' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সবাইকে অভয় বাণী দিয়ে বুক চিতিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। শুধু আমার মাস্টারমশাই অনিলকুমার চন্দ বললেন—'সিনেমায় গল্প লিখছ, ভাল, কিন্তু একটু সাবধানে থেক।'

প্রথম শুটিংয়ের দিন ঘনিয়ে এল। আমার লাস্ট সীনের ডায়লগ লেখাও শেষ। ডায়লগ লেখায় সাহায্য করতে নিয়ে এসেছি আমার সহপাঠী বন্ধু আশিস দত্ত, সুধাংশু গুপ্ত এবং নির্মল চক্রবর্তীকে! শুটিংয়ের দিন চেনাশোনা ঘনিষ্ঠা কয়েকজনকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে এলুম

স্টুডিওতে। আমার মেয়ে বন্ধু কয়েকজনকেও—হাসি মিত্র, লীলা সুখতঙ্কর, মায়া দে সরকার—নিয়ে এলাম। এতবড় একটা ঘটনা হয়ে যাচ্ছে আর ওরা দেখবে না?

শুটিংয়ে এসে দেখি চমৎকার সেট। এন জি, মনিটর ইত্যাদি শব্দও ততদিনে জেনে গেছি, রঙিন ধুতি পাঞ্জাবি পরে পুরুষ চরিত্র আর রঙটঙ মেখে নারী চরিত্রের দল সেটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহরতে যারা এসেছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেখলুম গরহাজির। কী ব্যাপার? শুনলুম শেষ মুহূর্তে প্রণতি ঘোষ বাদ পড়েছেন এবং নায়ক প্রলয়ের পার্ট করবেন গুরুদাসের বদলে বিমান ব্যানার্জি। প্রণতি আমার পরিচিত, তার সঙ্গে প্রডিউসারের যোগাযোগ আমিই করিয়ে দিয়েছিলুম। তাকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকল।

অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে প্রথম দিনের শুটিং কোন ক্রমে কেটে গেল। তারপর হ'ল একনাগাড়ে আরও তিনদিন। চতুর্থ দিনেই 'প্যাক আপ'। সেট ভাঙো, তারিখ নাও পরের শুটিংয়ের।

এদিকে আমার গল্পও সংলাপ লেখার কাজ পুরো দমে চলেছে। আমার গল্প-বলা ভুল, সব ঘটনা সব আইডিয়া প্রযোজকের। আমি শুধু জোড়াতালি দিয়ে কাঠামোটা খাড়া রাখছি।

একদিন প্রযোজক এক উত্তুঙ্গরক্ষ ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন, ইনি অমুক, নিউ ফাইণ্ড। এঁর উপযোগী একটা চরিত্র তৈরি করে ফেলুন—সাইড রোল।

আমি বললাম—তথাস্তু।

আর একদিন প্রযোজক ডিরেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে এসে নতুন আর্জি পেশ করলেন—একটা হাসপাতালের সীন জুড়ে দেবেন, বুঝলেন। নায়ক বাস দুর্ঘটনায় পড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে।

আমি বললুম—তথাস্তু!

আর একদিনের কথা। আবার সেই প্রযোজক। বললেন—বস্তিতে কলেরা লেগেছে। নায়ক প্রলয় কলেরা রোগীর সেবা করছে, এই রকম একটা সীন দরকার।

আমার মুখে সেই একই উত্তর, তথাস্তু। নানাপ্রকার মোচামুচি আর সংযোজনে গল্পটা দাঁড়াল কিম্ভুত কিমাকার। আমি আপত্তি করি না, যদি হাতছাড়া হয়ে যায়। কনট্রাক্টে সইও হয় নি।

কনট্রাক্টের কথা একদিন তুললাম। প্রযোজক হাতে একশ টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন,— তার জন্য ভাববেন না, দু'এক দিনের মধ্যেই করে দিচ্ছি। আচ্ছা, টাকাটা নগদ না চেকে নেবেন ?

আমি একশ টাকাতেই খুশি। বললুম,—নগদ বা চেক যা প্রাণ চায় দেবেন।

যাচ্ছেতাই সেই গল্পের শুটিং ততদিনে আধে ক প্রায় শেষ। কাগজে প্রচারের কাজও অনেক দূরে এগিয়েছে। আমিও ততদিনে মোটামুটি সিনেমা পাড়ার লোক। এম এ পাশ করে এই লাইনে যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করব, সে বিষয়ে মনঃস্থিরও করে ফেলেছি।

হঠাৎ একদিন মাথায় বজ্রাঘাত। ডিরেক্টার আমার বাড়িতে এসে বললেন,—মশাই, কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। প্রডিউসার পালিয়েছে। কেউ টাকা পায় নি। আমি না, ক্যামেরম্যান না, আর্টিস্টরা না, স্টুডিও ফ্লোরের ভাড়াও অনেক টাকা বাকি।

তার মানে ?—আমার সবিস্ময় জিজ্ঞাসা।

মানে খুব সোজা। ডিরেক্টর জবাব দিলেন, কোন এক জমিদারের চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে প্রযোজক সিনেমায় হাত দিয়েছিল। হাজার কুড়ি খরচ করে বাকি টাকা এদিক সেদিক করেছে। এখন ভোঁ-ভাঁ। প্রযোজকের পাত্তা নেই, জমিদারটি মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। সিনেমা আর হবেনা। এখন কী করা যায় বলুন তো !

কী আর করা যাবে, এক নিমেষে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। আমি দুকান মলে ঠিক করলুম, আর ওদিকে না, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন এম এ পরীক্ষাটা ভালয় ভালয় দিতে পারলে হয়। গত ছ'মাস তো ক্লাসের সঙ্গে ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক পাতিয়েছিলুম।

কিন্তু প্রশ্ন, বন্ধুবান্ধবরা কী ভাববে? খুব তো ফলাও করে নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়েছিলেন, হেন করছি তেন করছি বলে বাহবা নিচ্ছিলুম—এখন?

এখন সিনেমা লাইনের খুরে দণ্ডবৎ। ছ'মাসের পারিশ্রমে হাতে এসেছে কুললে একশ টাকা। এমন হবে জানলে আগেই না হয় বেশি কিছু টাকা নিয়ে নিতুম। কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা তো পাওয়া যেত। তবে দিত কিনা কে জানে, নিশ্চয়ই গোড়া থেকে না দেবার মতলব ছিল। এবং গোড়া থেকেই বোধহয় ঠিক করে নিয়েছিল সিনেমা মাঝপথে থামিয়ে দেবে। নইলে আমার মত অনভিজ্ঞকে না চাইতেই গল্প লিখতে ডেকে নিয়ে যাবে কেন? মুখ গোমড়া করে আবার ক্লাসে মন দিলুম। সিনেমার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলেই বলি—হচ্ছে, তবে জানইতো ভাই এ লাইনে কত ঝামেলা! টাকার জন্য আপাতত আটকে যাচ্ছে।

দিন যায়। সিনেমা লাইনের কথা আমিও প্রায় ভুলেছি। এম-এ পাস করে আবার শান্তিনিকেতনে চলে গেলুম এবং শেষ পর্যন্ত 'অধিনায়ক' প্রসঙ্গ একটা হাসির গল্পের খোরাক হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু নিজে ছাড়লেও 'কমলি' ছাড়বে কেন? সিনেমা লাইন শান্তিনিকেতনে এসে একদিন ধাওয়া করল। এবং সেই কাহিনীই সবচেয়ে মজার।

বোধহয় ১৯৫৪ সাল। দুপুরবেলা ঘরে শুয়ে আছি। হঠাৎ দরজায় টোকা। দরজা খুলতেই 'অধিনায়ক' যুগের একজন এসিঃ ডিরেক্টার। সে সময় ওঁর সঙ্গে বেশ খাতির হয়েছিল।

সঙ্গে আর একজন গোবেচারী ভদ্রলোক, দুজনকে সাদরে ঘরে নিয়ে এলুম। পরিচয় বিনিময়ও হল ডিরেক্টার বললেন সিনেমার জন্য আপনাকে একটি গল্প চাই, কোন আপত্তি শুনব না, আপনাকে রাজি হতেই হবে। কোন তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে দেবেন।

নেড়া বেলতলায় একবারের বেশি যায় না। আমিও যেতে চাইলুম না। কিন্তু অনুরোধে চাপে 'না' করার উপায় নেই। সঙ্গের সেই

ভদ্রলোক এতক্ষণে মুখ খুললেন--আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমরা পরের ট্রেনেই চলে যাচ্ছি। এই নিন একশ টাকা (আবার সেই একশ টাকা!) আপনার কাগজ কালি ইত্যাদি কেনার জন্য অল্প কিছু। না-না, আপত্তি করতে পারবেন না, আপনাকে নিতেই হবে।

ভদ্রলোক জোর করে আমার হাতে দশ টাকার দশখানা নোট গুঁজে দিলেন। কী বিপদেই পড়েছিরে বাবা!

তারপর নানা গল্প। হঠাৎ ডিরেক্টার আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেলেন। ফিস ফিস করে বললেন—আপনাকে কস্মিন কালেও গল্প লিখতে হবে না। আমি চাল মেরে ওই বোকা লোকটাকে নিয়ে এসেছি। পঞ্চাশ টাকা আমাকে দিয়ে দিন, বাকি টাকা আপনার।

পরের ট্রেনে দুজনে ফের কলকাতা। আমি ওই টাকায় কালোর দোকানে সবান্ধবে চপ কাটলেট ধ্বংস করলুম। এবং বলাবাহুল্য, অগ্রিম দাদন দেওয়া সেই গল্প কস্মিনকালেও লেখা হয় নি।

বিশুবাবু ঘরে ঢুকতেই মনোজিৎ বললে, প্লীজ, ময়মনসিং নিয়ে আজ কোন কথা শুনব না। ইন্দিরা গান্ধী ইস্টবেঙ্গল ইলিশ মাছ— যে কোন বিষয়ে কথা বলুন, শুনতে রাজী আছি। কিন্তু ময়মনসিং? ইম্‌পসিব্‌ল্‌!

বিশুবাবু কটমট করে তাকালেন মনোজিতের দিকে। দরজার গোড়ায় তাঁর দাঁড়ানো চেহারা এক নজরে চেয়ে বিজয়বাবু বললেন, সুপার্ব, এক্‌সেলেণ্ট ফ্রিজ শট।

আমি মনোজিতের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম। ইতিমধ্যে বিশুবাবু তার ঢ্যাঙা শরীরটা তক্তপোশের উপর এলিয়ে দিয়ে বললেন, হ, হ, বুজছি, বুজছি, আমি হালায় ময়মনসিং কইলেই তোমাগো জাত যায়, আর বিজয়বাবু যে খালি সিনেমার শট মাইরা যাইতাছে, সিডার কুনো দুষ নাই।

সোফার কোণে ঘাড় কাত করে বসা বিজয়বাবু নড়েচড়ে বসলেন। মনোজিৎ আর আমি প্রাণ খুলে হাসলাম।

টালিগঞ্জ রিজেণ্ট পার্কে আমাদের আড্ডাটি নিতান্তই আড্ডা। তার ফুল টাইম মেম্বার আমরা চারজন। দু'জন সাংবাদিক, একজন ব্যবসায়ী, একজন সিনেমা পরিচালক। কারো দশটা-পাঁচটা নেই। পার্ট টাইমদের মধ্যে আছেন আর এক সাংবাদিক, প্রণবেশবাবু, গোল পার্ক রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটে থাকেন, আমরা আড়ালে বলি পানু মহারাজ। নামটি অবশ্য আমার ছেলে সুমিতের দেওয়া। ফিটফাট ধোপদুরস্ত চেহারা। এসেই তক্তপোশের উপর পা দুটি তুলে ফর্টি কিলোমিটার স্পীডে হাঁটু নাচাতে থাকেন। আর আছেন ঐতিহাসিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য, কবি আশিস সান্যাল, সওদাগরি অফিসের বড় কর্তা অজিত রায়, কবি ও গল্পকার অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী, বোড়াল গ্রামের কৃষিবিদ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞাপন জগতের সুবীর দাশগুপ্ত সস্ত্রীক, হীরক দত্ত, বড়দের ধমক খাওয়ার

জন্যে সদাপ্রস্তুত পার্থ চন্দ, লিখিয়ে শ্যামল গাঙ্গুলী, দার্শনিক মনোরঞ্জন বসু, বেতার-ঘোষক তরুণ চক্রবর্তী, গাইয়ে নির্মলেন্দু চৌধুরী, সরকারী অফিসার নরেশ সাহা, চাকরি-প্রার্থী সুলেখক ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী, নাচিয়ে বিপিন সিং, মুদ্রণবিশারদ প্রসূন দত্ত—নানা পেশার নানা প্রকার লোক আমার ছোট্ট ঘরটির আড্ডায় সময় খরচ করেন রবিবার সকাল। সোফা তক্তপোশ মোড়ায়ও যখন কুলোয় না, স্রেফ মেঝেতে কেউ কেউ বসে পড়েন। চৌকিদার কিংবা জমিদার। মাঝে মাঝে চা, তার জন্যে আমার স্ত্রীকে অন্ততঃ বিয়াল্লিশ বার সাধাসাধি এবং এন্তার সিগারেট। সিগারেট আছে কিন্তু কারো কাছে দেশলাই থাকে না। মনোজিৎ বাড়িতে ঢুকলেই মা প্রবলবেগে রান্নাঘরে ঢুকে দেশলাই বাক্স অন্যত্র সরান, নইলে এক-ডজন দেশলাই আড্ডায় ধ্বংস হবেই।

নিয়মিত সেই চারজনের মধ্যে বিশুবাবু আসেন দেরিতে। এসেই বলবেন, আইজ ভীষণ কাম, অকৃখনি যাইতে অইব। তারপর ঘণ্টা চার কাটিয়ে সবার শেষে উঠে বললেন, আইজ কেলেঙ্কারি অইছে। কামটাই মাটি।

বিশুবাবু কেউ নতুন এলে বা কারো নাম উঠলে প্রথমেই খোঁজ নেন বাড়ি ময়মনসিং কিনা। মিলে গেলে লাফ মেরে ওঠেন আনন্দে। যেদিন জানলেন বনানী ঘোষের বাড়ি ময়মনসিং, চোখ গোল গোল করে বললেন, কী মিঠা আপনার গলা! কোন প্রসঙ্গ উঠলে তিনি ময়মনসিং ঠেলে নিয়ে যাবেনই। মনোজিতের এতে আপত্তি।

বিজয়বাবু অল্পভাষী মানুষ। যা বলেন মেপে মেপে। চোখে উদাসী উদাসী ভাব। সব কিছুতেই তিনি সিনেমার শট খুঁজে বেড়ান। ভাল ডায়ালগ মনে গেঁথে নেন, ভাল ভঙ্গী ছবির ফ্রেমে বাঁধেন। প্রসঙ্গ নীহার রায়ের বাঙালীর ইতিহাস হোক, আর জনতা কর্মসমিতির বৈঠকই হোক, তিনি সিনেমা লাইনে এনে ফেড ইন ফেড আউটের পর ফেড আপ করে দেবেনই!

মনোজিৎ ঘুমোয় সকাল দশটা অবধি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হয়ে আড্ডায় এসে ক্লান্তি ঘোচাতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। নতুন কেউ

এলে ঘুম ঘুম চোখে চিৎকার পাড়ে, 'আসুন, আসুন, শুয়ে পড়ুন।' মনোজিৎ গোড়ায় কোন কিছু বললেই সুন্দরবনকে জড়াত, যেমন আমি জড়াতাম শান্তিনিকেতন বা রবীন্দ্রনাথকে। ইদানীং বিজয়বাবু আর বিশুবাবুকে ঠেকা দিতে গিয়ে দু' জনেই সাবধান হয়ে গেছি। মনোজিতের মুখে সুন, আর আমার মুখে শান্ আসতে না আসতেই জিভ গুটিয়ে নিতে হয়, নইলে অন্য দু' জনের পিছনে লাগা বরবাদ হয়ে যাবে।

তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় একবার না একবার রবীন্দ্রনাথ হবেই। মনোজিৎ ভাল পাঠক, বিজয়বাবু ভাল শ্রোতা, বিশুবাবু উৎসাহী সমজদার এবং আমি একজন প্রবল বক্তা। দু' ভাঁজ নোংরা ধুতি লুঙ্গির মত পরে এবং গেঞ্জি গায়ে আমি যখন রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু বলতে শুরু করি, পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে জানতে চায় কাকে আমি বকছি। ইদানীং আবার পরিপ্রেক্ষিত, অতীন্দ্রিয় ইত্যাদি কঠিন কঠিন কথার তোড়ে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মুখের জলও দু'চার ছিটে ছুটতে থাকে। মনোজিৎ বলেছে, একটা গ্যাস মাস্কের অর্ডার দিয়েছে, আমি চেঁচাতে শুরু করলেই মাস্কটা পরে নেবে।

আমাদের আড্ডার মাঝখানে ক্ষণিকের অতিথিদের সংখ্যাও প্রচুর। তৎসহ টেলিফোন কল। সেগুলোর শ্রেণীবিভাগ করলে মোটামুটি দাঁড়ায় এই রকম: (১) একটা কবিতা ছাপাতে চাই বা বিবৃতি দিতে চাই; (২) রবীন্দ্রসদন হল অমুক তারিখে দরকার; (৩) শান্তিনিকেতনে মেয়েকে ভর্তি করতে চাই; (৪) একটা ফ্ল্যাট চাই, গৃহমন্ত্রীকে বলুন; (৫) মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ট্রান্সফার চাই; (৬) পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি করতে চাই মেসোমশাইকে; (৭) মাদ্রাজের রেল-টিকিট বা দিল্লির প্লেন-টিকিট চাই; (৮) অমুক জায়গায় গাইতে চাই, যদি বলে দেন; (৯) উলুবেড়েতে সাহিত্য সভায়, হেঁঃ হেঁঃ, প্রধান অতিথি আর কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, হেঁঃ-হেঁঃ আপনাকে করতে চাই; (১০) আমরা একটা স্যুভেনির বের করছি, লেখা চাই; (১১) ফাংশন করছি, আর্টিস্ট চাই; (১২) চাকরি চাই; (১৩) কিছুই

চাই না, এখানে আড্ডা হয় শুনে চলে এলাম।

আমরা তখন আড্ডায় এত মত্ত থাকি যে, কোনো আবেদনেই 'না' করি না। তবে এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়! তাঁদের মধ্যে কেউ থাকেন, কেউ কেটে পড়েন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

সেদিনও আমরা চারজনে হাজির। মনোজিৎ তাকিয়া বুকে ঠেসে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, বিজয়বাবু সোফায় হেলান দিয়ে তামাকপাতায় চুন মেশাচ্ছেন, তৈরি হলেই জানালার কাছে বসা বিশুবাবুকে খৈনির ভাগ দেবেন। বিশুবাবু আজ কোন কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। খৈনিটা এমনভাবে হাত বাড়িয়ে নিলেন যেন বিজয়বাবুর তাতে কৃতার্থ হওয়ার কথা। বিজয়বাবু ব্যাপারটা আন্দাজ করে আস্তে আস্তে বললেন, ও বিশুবাবু, ব্যাপারটা কী? বারুদের স্তূপে দেশলাই কাঠি পড়ল। বিশুবাবুর হুংকারে মনোজিতের ঘুম গেল ভেঙে, আমার হাত থেকে পড়ে গেল টেলিফোনের রিসিভার।

জিগাইছেন ক্যান—বিশুবাবু বিজয়বাবুকে তেড়েমেড়ে বলেন—জানেন না, ইস্টবেঙ্গল হারলে আমার ম্যাজাজ ঠিক থাকে না। নিজে তো মুহনবাগান, কষ্টডা বুজবেন কী কইর‍্যা? আমারে দেইখ্যা হাসতাছিলেন ক্যান? আমি হালায় কি বুজি না?

বিজয়বাবু বলেন, দূর মশাই, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল আমার মাথায়ই নেই। আমি ভাবছিলাম বাঘের উপর একটা ডকুমেণ্টারি তুলব কিনা।

বাঘের উপর?—মনোজিৎ বাঘের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে,—দাঁড়ান আপনাকে একটা ভাল পরামর্শ দিই।

দূর, বাঘ-টাঘ দিয়া কী অইব? পারেন তো ভূত-টুত লইয়া ছবি তোলেন—বিশুবাবু খৈনি ঠোঁটের তলায় চালান করে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন।

বাঘের কথাই যখন উঠল, তাহলে আপনি পরশুরামের দক্ষিণ রায় আর রবীন্দ্রনাথের বাঘের উপর সেই কবিতাগুলো—আমার সংযোজন।

বিশুবাবু চমকে বলেন, রবি ঠাকুরে বাঘের উপরেও পইদ্য লিখছে ? তা'ও তোমরা ক্যান কও গ্রেটেস্ট পোয়েট না ?

মনোজিৎঃ ও, বাঘের উপর কবিতা লিখেছেন বলেই গ্রেটেস্ট পোয়েট ? বলিহারি আপনার বুদ্ধি !

বিশুবাবুঃ ছ্যাখো মনোজিৎ, ফাইজলামি করবা না। আমি কইতাছি, রবি ঠাকুরের নজর কত দিকে।

বিজয়বাবুঃ এ তো মহাবিপদ! আমি তুলবো বাঘ নিয়ে ছবি, সবাই উঠে পড়ে লাগলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। অমিতবাবুরও কাণ্ড, বাঘ থেকে টেনে আনলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিশুবাবুঃ আর আমি হালায় ময়মনসিং আনলেই অইন্নায়। কয়েন তো বিজয়বাবু ভাল কইরা।

বিশুবাবু খুব খুশি। মনোজিৎ তদধিক। কারণ ততক্ষণে বাড়ির বালক, পরিচারক জয়দেব, যাকে মনোজিৎ কখনও ডাকে হিরণ্যগর্ভ কখনও চূড়ামণি কখনও বোধিদ্রুম, চা নিয়ে এসেছে। লেবু-চা। বিজয়বাবুর বাঘও চাপা পড়ল। বেচারা মনোজিৎ বাঘের গন্ধ পেয়েও সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারল না।

এদিকে চায়ে চুমুক পড়তে না পড়তেই মুদ্রাদোষে কাতর বসন্ত এসে হাজির। কালে ব্রাজিলের মশার উৎপাত কিংবা নাগাল্যাণ্ডে পুদিনার চাষ সম্পর্কে দুর্লভ বই এবং পকেটে নতুন পাওয়া বিম্বিসারের মুদ্রা। তার পিছন পিছন প্রণবেশবাবু। প্রণবেশবাবু প্রায় রোজই আসেন, আমাকে কী একটা বিশেষ কথা বলতে। কিন্তু আড্ডায় এমনা জমে যান, শেষ-মেষ আর তা বলা হয় না। আবার আসেন। আবার না বলে চলে যান। আবার আসেন।

বসন্ত এসেই বলল, 'আমার চা।' বিশুবাবু কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আমার স্ত্রীর সহানুভূতি আদায়ের জন্যে বললেন, দেখো ভাই বসন্ত, যখন তখন আইলেই তো আর চা পাওন যাইব না। চা খাইতে অইলে আগে আইতে অয়।

বসন্ত তার রোদ-চশমা আর গাড়ির চাবি সেন্টার টেবিলে রেখে

সামান্য মৌরী-হাসি ঠোঁটের ডগায় ছড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইল, কার বাড়ি আইছি, অমিতবাবুর না বিশুবাবুর ?

বিশুবাবুর পাল্লায় পড়ে বসন্ত ইদানীং দু' চারটে বাঙাল কথা রপ্ত করেছে। বিশুবাবু বসন্তকে কোন পাত্তা না দিয়েই বললেন, ধরতা পার আমারই বাড়ি, আমি আড্ডায় না আইলে তো তোমাগো ভাত অজম অয় না।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে মনোজিৎকে বাধ্য হয়ে উঠে বসতে হয়েছে। চোখে মুখে প্রচণ্ড ঘুম, তৎসহ বিরক্তি। বিজয়বাবু বেচারাকে জায়গা ছাড়তে কাত না হয়ে সোজা বসতে হয়েছে। হাতে নিউজ উইক। মাথায় কোন শট। আর আমি ওদিকে প্রণবেশবাবু ও বসন্তর চায়ের জন্যে হাঁক পেড়ে আগের রাতে আবিষ্কার করা রবীন্দ্র-জীবনের একটা তথ্য সবিস্তারে শোনাব কিনা ভাবছি। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না। বিশুবাবু টেলিফোন করতে গিয়ে বার বার এনগেজড্ সাউণ্ড পাওয়াতে চিৎকার পাড়লেন—ল্যাথি মাইর‍্যা ভাইঙ্গা দিতে ইচ্ছা করে। প্রণবেশবাবুর হাঁটুনাচানো চিৎকারের চোটে চল্লিশ কিলো-মিটার স্পিড থেকে আশী কিলোমিটারে উঠে গেল। বসন্ত বলল, ময়মনসিং-এর লোকেরা এত চেঁচায় !

বিশুবাবুর উদাসী উত্তর, হ' ভাই, কইবাই তো, আমরা বাঙালরা আইছিলাম বইলাই তো বাইচ্চা গেছ, না-ইলে, না-ইলে, না-ইলে—কী যে অইত ভাবতাই পারতাছি না।

এমন সময় এলেন মনোরঞ্জনবাবু। সৌম্যমূর্তি, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, মুখে পান, বগলে বই। পিছনে অরবিন্দ ভট্টাচার্য। এসেই বললেন, সব কুশল তো ? অমিতবাবু ? মনোজিৎ ? বিশুবাবু ? বিজয়বাবু ? তা ভালো থাকবেনই তো, বৃহস্পতি স্বগৃহে ফিরে এসেছেন যে ! আমি আর বসব না অমিতবাবু, আজ চলি।

কিন্তু আমরা কেউই তাঁকে চলতে দিতে নারাজ। কারণ মনোরঞ্জনবাবু এলে পরাবিদ্যা, চিৎশক্তি পরম্পরা কুলকুণ্ডলিনী ইত্যাদি অনেক কিছু আমরা জানতে পারি। বিশুবাবু পর্যন্ত বাঙাল কথা ভুলে

গিয়ে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। বলেন, অদৌ উচ্ছাসিত। মনোজিৎ সংশোধন করে বলে, হল না। বলুন আদৌ উচ্ছ্বসিত। বিশুবাবুর হাজির জবাব—অইছে অইছে, বুজছ কি না কও।

মনোরঞ্জনবাবুর তন্ত্র সম্পর্কে নতুন বই বেরিয়েছে। বিজয়বাবু ভয়ে ভয়ে আছেন, তন্ত্রের গুহ্যতত্ত্ব নিয়ে না আবার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হয়। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু তন্ত্রের ধারে কাছে না গিয়ে মনোজিতের পিছনে লাগলেন—এই যে মনোজিৎ, তোমাকে যেন আরো ইয়াং দেখাচ্ছে।

মনোজিৎকে কোন জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে বিশুবাবু বলতে লাগলেন—দেখাইব না, ডুইব্যা ডুইব্যা জল খাইতাছে।

তার মানে ?

মানে-টানে কিছু নাই। প্রেমে পড়লে ইয়াংই দেখায়।

তাই নাকি ? বলেন কী ?—মনোরঞ্জনবাবুর চোখ কপালে ওঠে।

বিশুবাবু ফিসফিসিয়ে আবার বলেন—যা কইতাছি খোঁজ কইর‍্যা দেখেন।

যা—বাব্বা ! মনোজিৎ অবাক্। তার মুখে এই দুটি মাত্র বিস্ময়-সূচক শব্দ। আমি ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তোলার জন্যে বললাম—না বিশুবাবু, এটা ঠিক হচ্ছে না। মনোজিৎ কন্‌ফিডেন্‌শিয়ালি যা সেদিন আপনাকে বলেছে, তা প্রকাশ্যে বলাটা ঠিক হল না।

মনোজিৎ আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মনোরঞ্জন-বাবু শাসনের সুরে বললেন—নো, মনোজিৎ, কনট্রোল কর নিজেকে। এটা উচিত হচ্ছে না, যোগ-টোগ কর। মন স্থির হবে, মস্তিষ্ক সৎপথে চলবে।

প্রণবেশবাবু অবাক্। বিজয়বাবু মুচকি হাসছেন। বসন্ত কী ফোড়ন কাটতে যাচ্ছিল, মনোজিৎ তখন বিশুবাবুর দিকে কটমট করে এমনভাবে তাকাল, সত্যযুগ হলে বিশুবাবু ভস্ম হয়ে যেতেন। আমি এই রসিকতাকে আরো রহস্যের মধ্যে দেওয়ার জন্যে—থাক্, এ সব নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই,—বলে নতুন প্রসঙ্গ তুললাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে এসে গেছেন শিববাবু। বয়স সত্তরের উপর।

মাথায় এক ঝাড় সাদা চুল। গরমেও গলায় এণ্ডির চাদর জড়ানো। হাঁটুর উপর ধুতি। সাইকেল মেরে এসেছেন বোড়াল থেকে। অসাধারণ জ্ঞান সর্ববিষয়ে। অসাধারণ মুক্ত মন। বাইরেটা প্রাচীন, ভিতরটা আধুনিক। চাষবাস, ইতিহাস, ভূগোল, কবিতা, দর্শন, সর্ববিষয়ে সমান জ্ঞান। ডালিয়া গোলাপ লেটুস পাতা আমের পর তাঁর বর্তমান গবেষণার বিষয় কাঁঠালের ভূঁতি। তিনি এসে কাউকে কিছু না বলে থলেটা চেয়ারের কোণে ফেলে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর চারমিনার ধরিয়ে সেদিনের খবরের কাগজটা টেনে নিলেন।

দ্বিতীয় কিস্তি চা এল। মনোরঞ্জনবাবু আমার সঙ্গে খানিকটা প্রাইভেট কথা সেরে নিলেন। বসন্ত আর মনোজিতে আগামী রবিবার সুন্দরবন যাওয়া নিয়ে পরামর্শ শুরু করেছে। বিজয়বাবু নিউজ উইক ছেড়ে ইলাসট্রেটেড উইকলি ধরেছেন। প্রণবেশবাবু আর অরবিন্দের মধ্যে আলোচনার বিষয় কী ধরতে পারছি না, সম্ভবতঃ নরেন্দ্রপুরে কাউকে ভর্তির ব্যাপার। প্রণবেশবাবুর একটি কথাই শোনা গেল, কানাই মহারাজকে বলতে পারলে উত্তম। বিশুবাবু আবার ফোন করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন। আড্ডাটা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে।

হঠাৎ শিববাবু খবরের কাগজ মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, আমি এক অদ্ভুত জিনিস দেখে এয়েছি গতকাল। সেটা কি আপনারা শুনবেন?

খণ্ডচ্ছিন্ন আড্ডাটা আবার জোড়া লেগে সবাই উৎকর্ণ হলেন শিববাবুর দিকে। 'শুনব, শুনব', সকলেরই এক কথা। বিশুবাবু তারই মধ্যে বললেন, গল্পটা বেশীক্ষণ ধইর‍্যা লম্বা কইর‍্যা কইবেন না। সংক্ষেপে কইবেন। আমারে অখনই তাইতে অইব, কাম আছে।

কুড়ি মিনিট, না দশ মিনিট?—শিববাবুর জিজ্ঞাসা।

না, পাঁচ মিনিট।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু পয়েন্ট আছে যে আটটা?

চাইরডায় সারন যায় না?

যায়। চার কেন, তিনেও হয়। শিবুবাবু শুরু করলেন—

'আমাদের গাঁয়ে একটা মসজিদ আছে। মসজিদের পাশেই থাকে নুরুদ্দিন। তার নাতির সঙ্গে দেখা কাল সন্ধ্যেবেলা। হন হন করে ছুটছে, আমি সাইকেলে ফিরছিলুম কামাল গাজি থেকে। এমন সময়—'

সাস্‌পেন্স! কিন্তু ইস, শিববাবুর কথা আর শেষ হল না, আস্ত একখানা হারমোনিয়াম ঘাড়ে করে নির্মলেন্দু চৌধুরী এসে হাজির! পূজার গান লেখাতে হবে আমাকে দিয়ে। নির্মলকে দেখে সবাই হই হই করে উঠল। শিববাবুর গল্প চাপা পড়ল। মনোজিৎ চেঁচিয়ে উঠল--নির্মলদা, গান গান।

না রে ভাই, গলা খারাপ আইজ—

একটা, একটা। প্লীজ!

আর বলতে হল না। হারমোনিয়াম খুলে নির্মল গলা খারাপের কথা ভুলে মেরে দিয়ে 'বন্ধুরে' বলে এমন টান মারল যে, আমার ঘরের জানলার কাঁচ কাঁপতে লাগল, এবং আশেপাশের জানলা দিয়ে অনেকগুলি চোখ ও কান খাড়া হয়ে উঠল। নির্মল গোটা সাতাশ গান গেয়ে আমাকে বলল, এখন আমার পূজার গানের কথা চাই, পাশের ঘরে চল। কাল সকালে রেকর্ডিং।

রেডিও অফিসে ডিউটিতে যাওয়ার পথে এতক্ষণে এলেন তরুণ চক্রবর্তী। গতকাল পর্যন্ত গালে দাড়ি ছিল, আজ নেই। দাড়ি রাখবে কি রাখবে না ঠিক করতে পারছে না, ঝকঝকে চেহারা। এসেই বলল—আমিও এলাম, গানও শেষ হল।

বিশুবাবু তরুণকে দেখলেই ধমক না দিয়ে কথা বলতে পারেন না। আজও তা-ই হল।—সময়ে আইলা কবে? হাওড়ার লুকেদের হক্কল বেপারেই লেট। বিয়া পর্যন্ত অখমো করতা পারলা না। তাও লেট। বিশুবাবু অনর্গল বলে গেলেন।

বেচারা তরুণ মুখ আমসি করে বলল—কী করব, সকাল থেকে গজল প্র্যাকটিস করছিলুম। মেহেদী হাসানের যা একখানা এল. পি. পেয়েছি না, কাল উলুবেড়ের খেপে গজলই গাইব।

বিজয়বাবু এতক্ষণে গলা ছাড়লেন—তরুণ, তুমি ঠিক করে ফেল,

গজল গাইবে, না আধুনিক গাইবে। নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীত। হেমন্ত হবে, না জর্জ বিশ্বাস হবে। না মেহেদী হাসান হবে। সেটা স্থির কর আগে, তারপর তোমার কথা শুনব।

তরুণ বিরক্ত হল। কিন্তু মুখে হাসির রেখা যথাসম্ভব ফুটিয়ে কী একটা বলতে চাইছিল, মনোজিৎ তার আগেই হারমোনিয়ামটা বাড়িয়ে দিল। তরুণ ডান পাটা কাত করে, চুলটা বা হাতে ঠিকঠাক সাজিয়ে গান ধরে ফেলল চোখ বুঁজে। তরুণের ওই গুণ, গান নিয়ে সাধাসাধি করতে হয় না। লোকসঙ্গীতের রেশ যেতে না যেতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত—'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে —'

নির্মল ছটফট করছে গান লেখানোর জন্যে, বিজয়বাবু আর একখানা ম্যাগাজিন মুখের কাছে তুলে ধরেছেন। সূর্যইণ্ডিয়া। শিববাবু গল্পটা না বলেই কখন যে উঠে চলে গেছেন কেউ খেয়াল করি নি। আরো খেয়াল করি নি বিজয়গড় থেকে পরিমল হোম, সন্তোষপুর থেকে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, রাসবিহারী এভিনিউ থেকে ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী, মুর এভিনিউ থেকে হীরক দত্ত, জুবিলি পার্ক থেকে প্রসূন দত্ত কখন এসে নানা জায়গা দখল করে বসে গেছেন। ইতিমধ্যে অজিত রায় ও পার্থ চন্দ ভিড় দেখে পাশের ঘরে চলে গেল। তাদের সঙ্গে গেল অরবিন্দ ভট্টাচার্য। দোরগোড়ায় জুতোর স্তূপ। চায়ের কাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সাতটা অ্যাশট্রে সিগারেটের ছাইয়ে ভর্তি। কেউ বসে, কেউ কাত হয়ে, কেউ দাঁড়িয়ে।

বসন্ত আলেকজাণ্ডারের আমলের কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রাও এনেছিল দেখাতে, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। মনোরঞ্জনবাবুর প্রাইভেট কথা শেষ করতে পারছেন না। মনোজিতের ঘুম মাঠে মারা। নির্মল আমাকে অনেক সাধাসাধি করেও গান লেখায় বসাতে পারছে না অমরেন্দ্র পকেটে নিয়ে এসেছে দীর্ঘ একটি কবিতা। সেটা পকেটে রেখেই একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। হীরকও তাই তাঁর অল্প দু' চারটি কথা, একটু হাসি। তরুণ হারমোনিয়ামে বেলে করেই যাচ্ছে, কেউ বললেই আর একটা গান ধরে। তারই মাঝখানে

বিশুবাবু পরিমলদাকে বোঝাচ্ছেন কী করে বাংলা উচ্চারণ করতে হয়। দু'জনেই ময়মনসিংহের লোক। কী একটা কথায় পরিমলদা যতই বলেন, 'নাইট্ট', বিশুবাবু ততই বলেন, আরে 'নাইট্ট' না, 'নাট্ট', অ্যাদ্দিন কইলকাতা থাইক্যা উচ্চারণডা ঠিক করতা পারলা না।

ইতিমধ্যে মণিপুরী নাচিয়ে বিপিন সিং তাঁর ছাত্রী দর্শনা জাভেরিকে নিয়ে হাজির, সবাই নড়েচড়ে বসলেন। বিপিন সিং বিগলিত বিনয়ে সবাইকে নমস্কার করে বলেন, না, না, আমরা বসব না, টেক্সি দাঁড় করায়ে আসেছি। অমিতাভবাবুর কার্ডটা দিয়া গেলাম। একাডেমিতে রবিবার প্রগ্রাম, নিচ্চয় আসবেন। নমস্কার। দর্শনাও একটু হেসে নমস্কার করল। দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। আমি সেই লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরেই তাঁদের এগিয়ে দিলাম সিঁড়ি অবধি।

ফিরে এসে দেখি পরিমলদা আর বিশুবাবুতে বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ নিয়ে তখনও তর্ক চলছে। পরিমলদা সাক্ষী মানলেন মনোজিৎকে, আইচ্ছা মনজিৎ, কও দেখি, বিশু আমারে উচ্চারণ শিখায় কুন সাহসে? আমি শান্তিনিকেতন পড়ছি পাঁচ বচ্ছর।

মনোজিৎ বলল, শান্তিনিকেতনের কথা আর বলবেন না পরিমলদা, অমিতদাও তো শান্তিনিকেতনের ছাত্র, কিন্তু উচ্চারণে সিলেটী পাণিনি।

সিলেটীদের উপর কটাক্ষ করায় নির্মল চেঁচিয়ে উঠল, সিলেটীদের নিয়া গাইল দিবা না মনোজিৎ, দেশ তো দুইটাই—সিলেত আর বিলেত।

আর ময়মনসিংহ কি বানের জলে ভাইস্যা গেল,—বিশুবাবু ধমকের সুরে বলেন।

"আরে দ্যাহেন তো কাণ্ডটা", পরিমলদা সখেদে বলেন। "আমি আইলাম অমিতরে একটা কথা জিগাইতে, আর অরা সিলেট ময়মনসিং লইয়া কাজ্যা কইরা মারতাছে, বিশুডার বুদ্ধিসুদ্ধি আর অইব না।"

মনোজিৎ মাঝখানে পড়ে বলে, না, না, আপনি বলুন পরিমলদা, কী জানতে চান?

আমি কইতাছি কি—পরিমলদা আস্তে শুরু করেন, আইজ যুগান্তরে তেজপুরের এক জাতিস্মর মাইয়ার কথা লিখছে। ব্যাপারডা অমিতে আর কিচ্ছু জানে কিনা।

"আমি ওসব বিশ্বাস করি না পরিমলদা, ছাপাতে হয় ছাপিয়েছি।" আমার নিস্পৃহ জবাব।

মনোজিৎ আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "ওসব বাজে জিনিস নিয়ে কেন যে মাথা ঘামান। জন্মান্তর জাতিস্মর সব ব্লাফ।"

মনোরঞ্জনবাবু শাসনের সুরে মনোজিৎকে তখনই বলেন, মনোজিৎ, দিস ইজ নট ইয়োর স্টেটসম্যান। এম্পেরিকেল ওয়ার্ল্ডের বাইরে আরও কত কিছু ঘটে, তার খবর তুমি রাখ কি? দেয়ার আর মোর থিঙ্কস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ মনোজিৎ।

বিশুবাবু মনোরঞ্জনদার সমর্থনে এগিয়ে গলা চড়িয়ে বলেন, যা জানো না, তা লইয়া তক্কাতক্কি করবা না। মনোরঞ্জনদার থাইক্যা তুমি বেশি যে জান না, এই কথাডা আমি জোর গলায় কইবাম। ঠিক তেজপুরের মাইয়াডার মতো আমাগো ময়মনসিং-এ এক সাহার পোলা—

উফ্, ইনকরিজিবল—মনোজিৎ বিশুবাবুকে থামায়—এক জাতিস্মর, তার উপর ময়মনসিং।

বিশুবাবু: না বাঙাল, না ঘটি ওই খুলনার লুকেরা অমন বকাবুকা কথা কইয়াই থাকে। তুমি জানো কচু। আমি যদি কই অ্যাটম বুমা বানাইতে আধ পোয়া ছাগলের দুধ লাগে, তোমার চুপ কইর‍্যা থাকনই ভাল। কারণ অ্যাটম বমার কিচ্ছু তুমি জানো না। ঠিক ওই রকমই পরলুক জাতিস্মর, আত্মা—এইসব তোমার রিপোর্টারী বুদ্ধিতে কুলাইব না।

প্রণবেশবাবু এতক্ষণে মুখ খুললেন, বললেন, বিশুবাবু অনেকটা ঠিক বলেছেন। আমাদের নরেন্দ্রপুরের আশ্রমে তেজপুরের মেয়ের মতই একটি মেয়ে বলল, তাঁর আগের জন্মের বাড়ি বর্ধমান!

মনোজিতের মন্তব্য: স্রেফ গাঁজা।

প্রণবেশবাবু থেমে গেলেন। বিশুবাবু কটমট করে তাকালেন মনোজিতের দিকে। মনোরঞ্জনবাবু বললেন, আমি উঠি। এসব আধিভৌতিক আধিদৈবিক জগৎ নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না।

আমি হাতে পায়ে ধরে মনোরঞ্জনবাবুকে আটকালাম। বললাম, মনোজিতের হয়ে আমরা সবাই ক্ষমা চাইছি। স্টেটসম্যান কাগজ যে বরাবরই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী, সে তো সকলেরই জানা। আর মনোজিৎ হল গিয়ে কিনা সেই স্টেটসম্যানের একজন রিপোর্টার। উপরন্তু নিতান্তই ছেলেমানুষ। ওর কাছে তার চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যায়। এবারের মতো ছেড়ে দিন বেচারাকে।

মনোরঞ্জনবাবু আবার বসলেন। বিশুবাবু বিজয়বাবুর কাছ থেকে চেয়ে এনে আর এক দফা খৈনি ঠোঁটের তলায় পুরলেন। আমি তপ্ত আবহাওয়াকে শীতল করতে তখন বললাম, অলৌকিক-টলৌকিক বুঝি না, জন্মান্তর জাতিস্মরও ঠিক জানি না, তবে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি, যার ব্যাখ্যা বুদ্ধিতে দেওয়া যায় না। শোনা কথা নয়, অমুকের পিসেমশাই তমুকের জেঠিমার কাছে শুনেছিল, এই রকম কোন জনশ্রুতিও নয়, আমার নিজের কানে শোনা, নিজের চোখে দেখা।

আমার হঠাৎ এই সিরিয়াস কথাবার্তায় সবাই নড়েচড়ে বসলেন। এমন কি যে প্রসূন দত্ত নানা পত্রিকার টাইপোগ্রাফি এতক্ষণ মন দিয়ে দেখছিল, সেও চোখ তুলে তাকাল। মৃদুল চ্যাটার্জী ও শ্যামল গাঙ্গুলী সেই সময়েই ঘরে ঢুকে সবার গম্ভীর গম্ভীর মুখ দেখে এক কোণে বসে পড়ল। মনোরঞ্জনবাবু বললেন, শুনি তাহলে ব্যাপারটা। বিজয়বাবুও এবার খৈনি ছেড়ে সিগারেট ধরালেন।

"জানেন বোধহয়"—আমি শুরু করি—"শান্তিনিকেতনে আমার বিশেষ—"

কথাটা শেষ হল না, বিশুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আবার শান্তিনিকেতন, আর আমি হালায় ময়মনসিং কইলেই মহাভারত

অশুদ্ধ হইয়া যায়।

মনোরঞ্জনবাবু ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ অমিতবাবুর কথাটা শেষ করতেও দেবেন না নাকি?

বিশুবাবু তখনও বলে চলেছেন, আমাগো ময়মনসিংয়ে ছাতিমগাছও আছে আমগাছও আছে, কেবল রবিঠাকুর ছিল না, এইডাই যা তফাৎ।

বিজয়বাবু মুখ খুললেন, এই তফাতটা খুব বড় তফাত নয় কি বিশুবাবু?

হীরক এতক্ষণে মুখ খুলল, কোথায় শান্তিনিকেতন আর কোথায় ময়মনসিং।

পরিমলদা ময়মনসিংয়ের লোক হয়েও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি বিশুবাবুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বললেন, রাম আর রামছাগল।

বিশুবাবু রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান আর কি, বসন্ত তখন গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক পাড়ল, সাইলেন্স, সাইলেন্স।

মনোজিৎ বলল, শুরু করে দিন তো অমিতদা।

বিশুবাবু ব্যাজার মুখ করে আমাকে বললেন, যত পারেন শান্তিনিকেতন চালান।

আর এক প্রস্থ চা এসে সবার মুখ বন্ধ করে দিল। আমি আবার শুরু করলাম:

শান্তিনিকেতনে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল শুভময় ঘোষ। সে মারা যায় ১৯৬৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। পি. জি. হাসপাতালে। সেই সময়কার ঘটনাই বলছি। শুভময় সেবার মস্কো থেকে ফিরেই ইনফেকটিভ হেপাটাইটিসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার আত্মীয়স্বজন আর আমরা বন্ধুবান্ধব দিনরাত হাসপাতালেই থাকি পালা করে। সে ছিল দোতলায় ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে সামনের বারান্দার দিকের এক কেবিনে। তারই সামনে বড় গাছটার তলায় আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, আর দিনভর রাতভর দূর থেকে দেখতাম অজ্ঞান শুভময়কে।

ডাক্তাররা আসতেন যেতেন, পরামর্শ করতেন, কিন্তু কিছুতেই আর জ্ঞান ফেরে না।

কুন ডাক্তারকে দেখাইতেছিলেন,— বিশুবাবুর প্রশ্ন এবং পুরো আড্ডা তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠল, সাইলেন্স।

বিশুবাবু চুপ মেরে গেলেন।

যা বলছিলাম, আমি বলে চলি, ডাক্তার ছিলেন নলিনী কোনার। ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধে থেকেই ক্রিটিক্যাল অবস্থা। ওর স্ত্রী সুপ্রিয়া, দাদা শান্তিদেব ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, বৌদি দিদি সবাই আছেন। আমরাও আছি। সত্যজিৎ রায় ও সুচিত্রা মিত্র খানিক আগে খবর নিয়ে চলে গেছেন। রাত আটটা নাগাদ ডাঃ কোনার গম্ভীর মুখে রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এলেন। আমরা রোজকার মত এগিয়ে গেলাম। ডাঃ কোনার শুধু বললেন, ওঁর স্ত্রীকে বলবেন, রোগী শান্তিতেই আছেন। ব্যাপারটা আঁচ করে নিলাম। বিষণ্ণ মুখে আমরা সবাই জড় হলাম সেই গাছতলায়। কেউ বেঞ্চিতে বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। হঠাৎ চড়া গলায় একটা গান শুনে চমকে উঠলাম সবাই। কী ব্যাপার? এতদিন হাসপাতালে আছি, কোন দিন তো এইভাবে কোন গানই শুনি নি। হাসপাতালে আবার গান কিসের? আরো অমঙ্গলের হাতছানি, যে গানটা ভেসে আসছে, সেটি শুভময়ের খুব প্রিয় গান—'যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে, দু' হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মত হেসে।' গানের লাইনগুলি শুনেই আমার গা শিউরে উঠল। আমার মত প্রত্যেকেই অবাক্, স্তম্ভিত। আমি জানি, শুভময় চলতে ফিরতে এই গান যখন তখন গাইত এবং সে যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন সেই গানটিই সারা হাসপাতাল ভাসিয়ে দিয়ে গেল, হাসপাতাল কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু কে গায় ওই গান? চারদিকে খুঁজেও গায়কের হদিস পেলাম না। তা ছাড়া হাসপাতালে গান? এ তো অবিশ্বাস্য! ওদিকে শুভময় তখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। শেষ নিঃশ্বাস পড়তে যা বাকি। অক্সিজেন দেওয়া চলছে। মাত্র চৌত্রিশ

বছরের একটা তাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে। আমরা তাকে ধরে রাখতে পারছি না। গান ভেসে বেড়াচ্ছে ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডের চার পাশে—যা পেয়েছি প্রথম দিনে।

গান থামল। আমি তল্লাসে নামলাম নিতান্ত কৌতূহলবশে। তল্লাসিতে কাজ হল। গানের উৎস পেয়ে গেলাম। হাসপাতালের পশ্চিম দিকটায় নার্সদের যে কোয়ার্টার, সেখানে কোন একজন সেবিকা তাঁর ঘরের রেডিওটা খুলে দিয়েছিলেন ফুল ভল্যুমে। হাওয়া ছিল পূর্বগামী। সড়াৎ করে ভেসে এল ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডের দিকে। এবং হবি তো হ সেই সময় গানটাও হল রবীন্দ্রসংগীত এবং অন্য কোন গান নয়, শুভময়ের সেই প্রিয় গান। যেন শুভময়কে মর্ত্যলোকের শেষ গান শোনানোর জন্যেই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। কিন্তু এই গানই বা কেন? আমাদের চেনা কেউ গায় নি তো? যে জানে এটা শুভময়ের প্রিয় গান? উঁহু, বেতারজগৎ খুলে দেখি গায়ক সুনীলকুমার রায়, দক্ষিণীর একদা শিক্ষক। শুভময়ের সঙ্গে তাঁর আদৌ পরিচয় নেই।

গান তো গেল, সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির অভিজ্ঞতাও কোন দিন ভুলব না! আমরা জনা কুড়ি লোক রাত জেগে বসে আছি হাসপাতালের সেই গাছের তলায়। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কেবিনের ভিতর শুভময়ের শয়ান শরীর। গানের রেশ তখনও সকলের কানে। কারো মুখে কোন কথা নেই। রাত বারোটা কি একটা হবে, হঠাৎ এক ঝাঁক কাক আমাদের মাথার উপরের গাছটাকে প্রবল বেগে নাড়িয়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল একসঙ্গে কা-কা-কা চিৎকার করতে করতে। এমন আনক্যানি এটমসফেয়ার, ভাবতেও পারবেন না। আগে অনেক রাত থেকেও যেমন কোন দিন গান শুনি নি, তেমনি কোন রাতেই কাকের চিৎকার পেড়ে পালানো দেখি নি। একটা ভৌতিক আবহাওয়া যেন।

কাকেদের ডানা ঝটফটানি আর সেই গানের কলি মিলে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে দিল এক লহমায়। কারো মুখে কথা নেই।

কালরাত্রি এইভাবে পার হল। শুভময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ১৫ সেপ্টেম্বর ভোর ছ'টা দশ মিনিটে।

কিন্তু এ কিছুই নয়, আমাদের জন্যে আরো বড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ওর কাজের দিন আমরা শান্তিনিকেতনে গেলাম দল বেঁধে। ওর স্ত্রী সুপ্রিয়া ওকে লেখা শুভময়ের কয়েকখানা চিঠি এগিয়ে দিল আমার সামনে। চিঠি পড়ে আমার মূর্ছা যাবার যোগাড়। ১৯৫১ সাল। তখনও ওদের বিয়ে হয় নি। সুপ্রিয়া ছিল দার্জিলিঙে। শুভময় লিখছে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো গান আছে যাতে কোন ঋতুর উল্লেখ নেই, কিন্তু মনে হয় কোন ঋতু যেন লুকিয়ে আছে। আচ্ছা বল তো, 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে' গানটিতে কোন্ ঋতু লুকিয়ে আছে? সুপ্রিয়া জবাবে লিখল - শরৎ। শুভময়ের আবার চিঠি, তুমি ঠিকই বলেছ, শরৎ-ই। ছোটবেলায় এই গান গুরুদেবের জন্মদিনে আমরা গাইতাম। কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে এটা মৃত্যুর গান। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি আমার মৃত্যু যেন শরৎকালে হয় এবং আমি যেন যা পেয়েছি প্রথম দিনে গানটি গাইতে গাইতে মরতে পারি।

তাই হল। এই চিঠি লেখার ঠিক এগার বছর পর শরৎকালেই তার মৃত্যু এবং অজ্ঞান ছিল বলে নিজে গাইতে পারে নি, তাই প্রকৃতি ওই গানটিই অন্য একজনকে দিয়ে তার কানের কাছে মৃত্যুর সময় শুনিয়ে দিলেন। এমন ইচ্ছাপূরণের ঘটনা আমি আর শুনি নি। এটাকে আপনারা কী বলবেন? কাকতালীয়? অলৌকিক? যা খুশি বলুন, আমার বিস্ময় আজও ঘোচে নি। এবং যা বললাম, তার ষোলো আনা সত্যি! একচুলও অতিরঞ্জন নেই।

সবাই চুপ। এমন কি বিশুবাবুও। বিজয়বাবু এই ঘটনাকে নিয়ে কোন সিনেমা তুলতে চান কিনা মুখের চেহারায় বোঝা যাচ্ছে না। মনোরঞ্জনবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, আসর আজ ভঙ্গ। সামনের রবিবারে এই নিয়ে সবার মন্তব্য শোনা যাবে। আজ দুটো বাজে প্রায়। মনোরঞ্জনবাবু যাবার আগে বললেন, আসছে

রবিবার আমি এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেব।

ঘর যখন অর্ধেক খালি, বাকিরাও যাই-যাই করছেন, এমন সময় স্ত্রী অর্চনাকে নিয়ে সুবীর দাশগুপ্ত হাজির। সরি, একটু দেরি।

সুবীরের কথা শেষ হবার আগেই মনোজিৎ ফোড়ন কাটল, সরির কিছু নেই, আপনি তো প্রতি রবিবার এই সময়ই এসে থাকেন। ইয়োর ইউজুয়াল টাইম। যান, আপনারা দু'জনে অন্য ঘরে গিয়ে অমিতদা-বৌদির সঙ্গে একটু গল্প করুন। আমি আর একটু ঘুমিয়ে নিই। আড্ডা মেরে ভীষণ ক্লান্ত, আর পারা যায় না।

সেই আমি

গাড়ি থামতেই একপাল লোক আমাদের ঘিরে ধরল। চারদিকে চিৎকার—কেরানিবাবুর বেটা আইল, বুড়া কেরানির নাতি আইল। দেখেই চিনলাম। ছুটে এসে ওরা জড়িয়ে ধরল আমাকে। এগিয়ে এল আপ্পানার ছেলে পোঙ্গা, ভজন মিস্ত্রি, অনিরুদ্ধ, বেশাউ। এলেন ধুতির খুঁটি খালি গায়ে জড়িয়ে সতীশ ঠাকুর - যিনি আমার ঠাকুরদার, আমার বাবার এবং আমার চুল কেটেছেন, দাড়ি কামিয়েছেন যত্ন করে। পাশে দাঁড়িয়েছিল আমার তের বছরের ছেলে সুমিত. সতীশ ঠাকুর বললেন— এবার ওর চুলটাও কেটে দিই।

চারদিকে লোক, চারদিকে কথাবার্তা। কিছুই আমার কানে যাচ্ছিল না। পঞ্চাশোর্ধ্ব এই আমি কলকাতার এক নামী কাগজের লোক, হিল্লিদিল্লি লণ্ডন নিউইয়র্ক করি, বইটই লিখি, কিন্তু এই মুহূর্তে এই বেলগাছতলায় দাঁড়িয়ে আমার একমাত্র পরিচয় আমি কেরানিবাবুর বেটা, আমি বুড়া কেরানির নাতি।

আমেরিকার নিগ্রো লেখক আলেক্স হালে-র মত 'শিকড়' দেখাতে নিয়ে এসেছি ছেলেকে। সঙ্গে স্ত্রী সুনন্দা। পয়লাপুল ছাড়িয়ে যখন তারাপুর টি কেম্পানির চা-বাগান এলাকায় ঢুকলাম, কচি চা-পাতার গন্ধ বুকে জমা শহুরে শ্যাওলা সরিয়ে স্মৃতির দরজা খুলছিল। পেরিয়ে গেলাম লাবক, পেরিয়ে গেলাম দেওয়ান, তারপর বড়থল—যেখানে আমার নাড়ির সম্পর্ক অন্তত একশ' বছরের। আমার জন্ম এখানে, আমার বাবার জন্মও। আমার ঠাকুরদা ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এখানেই চাকরি পেয়ে যান। সেই কবে, গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে। ঠাকুরদার পর একই পদে বাবার চাকরি, একই বাসায় পুনর্বাস। সেই বাসা, সেই ঘর, সেইসব মানুষদের মধ্যে বেঁচে থাকা দু'চারজনকে দেখাতে চলেছি ছেলেকে। আমিই কুলাঙ্গার—তিন পুরুষের মাথায় ছিটকে বেরিয়ে গেছি বাইরে।

পেরিয়ে গেলাম জলের কল, চা-ঘর, বাবার অফিস, তারপর এপাশে

হাসপাতাল, ওপাশে নাচঘর। সামনে দুর্গাঘর, পিছনে আমাদের সেই বাসার চিহ্ন নেই। বেঁচে আছে বহু স্মৃতি আর একটি বেলগাছ···· আমার ঠাকুরদার হাতে লাগানো, যার নিচেকার আঁতুড়ঘরে আমার জন্ম, আমার বাবার জন্ম, আমার কাকা-পিসি খুড়তুতো জেঠতুতো পিসতুতো ভাইবোনদের জন্ম। বেলগাছতলার মাটি এক আঁজলা তুলে খানিকটা মেখে দিলাম ছেলের কপালে, ছেলের গায়ে। নিজে তো মাখলামই।

ততক্ষণে এসে গেছে চা-শ্রমিক, আমার প্রিয়জনেরা। যাদের সঙ্গে খেলেছি, তারা আজ প্রৌঢ়। যাদের কাঁধে চড়েছি, তারা আজ বৃদ্ধ। ওরা ঘিরে ধরল আমাদের। যেন দীর্ঘদিন হারিয়ে-যাওয়া আত্মীয় না জানিয়ে হঠাৎ ফিরে এসেছে। নোংরা জামা-কাপড়, ধূলিধূসর শরীর, অসংখ্য মুখ জমা হতে লাগল চারধারে। এক-একটি মুখ, এক-একটি স্মৃতি। স্মৃতির ঘোরে ঘুরতে লাগল নাচঘর দুর্গাঘর বেলগাছ। কানে ঝিঁঝিপোকার মত বাজতে লাগল একটি আওয়াজ—কেরানিবাবুর বেটা, কেরানিবাবুর বেটা, কেরানিবাবুর বেটা।

আমার সব গেল গুলিয়ে, বিরাট একখানা কালো পর্দা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম পঞ্চাশ বছর আগে। আমার ছেলে কাছে নেই, আমার স্ত্রী কাছে নেই, বেলগাছটি আরো নবীন। পূবে ঘর, পশ্চিমে ঘর। উত্তরে ঘর, দক্ষিণে ঘর। মাঝখানে উঠোনে ছোটপিসিমার কোলে একটি শিশু।

১৯২৮ সাল। ম্যাকনিল কোম্পানির বড়খল চা-বাগান শিলচর শহর থেকে মাইল কুড়ি দূর। কলকাতা থেকে এত দূর যে, মনে হয় তারপরেই বুঝি পৃথিবীর শেষ। সেখানে আকাশ ঘন নীল, বন ঘন সবুজ। নানা রাজ্যের নানা লোক মিলে অদ্ভুত এক সংসার। সাহেব ম্যানেজার, বাঙালী বাবু আর ওড়িশা অন্ধ্র ছোটনাগপুর বিলাসপুর কোলাপুর পুরুলিয়া বর্ধমান বীরভূম থেকে আসা বিরাট শ্রমিকবাহিনী। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন কাছাড়ে চা-বাগানের সূত্রপাত, তার বছর কয়েকের মধ্যেই মা-বাবাহারা আমার ঠাকুরদা আর তাঁর দুই

দাদার সিলেট থেকে চাকরির খোঁজে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এইখানেই স্থিতি।

অস্বচ্ছল, কিন্তু সুখী পরিবার। আত্মীয়স্বজন অতিথি-অভ্যাগত নিয়ে বিরাট সংসার। আমার জন্মের সময় বাবা বেকার। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে স্বদেশী করেন, প্রবাসী বসুমতীতে কবিতা লেখেন, দিনরাত নানা ভাবনাচিন্তায় মেতে থাকেন। ঠাকুরদা পেন্সন নেওয়ার পর বাবা ঢুকলেন চাকরিতে। নিতান্ত অনিচ্ছায়। আমার ঠাকুরদা ভাল সেতার বাজাতেন, বাবা-কাকা-পিসিরা মেতে থাকতেন গান কবিতা হাসিঠাট্টা নিয়ে। ঠাকুরমা নিরাসক্ত নির্বিরোধ মহিলা। গরু-ছাগল কুমড়ো-বেগুনের ক্ষেত নিয়ে দিন কাটাতেন। আর মা রান্নাঘরে ঠেলতেন হাঁড়ি। পরিবারে টাকার অভাব ছিল, আনন্দের অভাব ছিল না।

আমি আমার ছোটপিসিমার কোলে কোলে কাটিয়েছি। বাবা লজ্জায় আমাকে প্রকাশ্যে কোলে নিতে বা আদর করতে চাইতেন না। আমি নিজে বেশি ভালবাসতুম ঠাকুরমাকে। আমাকে বেশি ভালবাসতেন আমার ঠাকুরদা—যিনি একজন সাত্ত্বিক মানুষ হিসাবে আজও ওই অঞ্চলে শ্রদ্ধেয়। আমার ঠাকুরদার নাম চন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরমার নাম বিন্দুবাসিনী—একসঙ্গে ওঁদের বলা হত চন্দ্রবিন্দু। ঠাকুরদা ছিলেন অতিথিপরায়ণ আত্মীয়বৎসল সমদর্শী। কাউকে তিনি কোনদিন বিমুখ করেননি। বৃহৎ সংসারের হাল ধরেছেন হাসিমুখে। ঠাকুরদার ভাগনে আমার জ্যাঠামশাইও ছিলেন পরিবারের একজন। ঠাকুরমার দাদার স্ত্রী—যাকে আমরা ডাকতুম ঠানদি— তিনিও তাঁর ছেলেমেয়েদের একই সংসারে রেখে দিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যান। এই গেরুয়াধারী ঠানদি ঘুরতেন তীর্থে-তীর্থে। হঠাৎ অন্ধ হয়ে ফিরে আসেন সংসারে। এই ঠানদির কাছেই প্রতিদিন আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতাম রামায়ণ-মহাভারতের গল্প। এই ঠানদির দিকে আমার দুই কাকাও ছিলেন বাবার মত সাহিত্যরসিক। শনিবারের চিঠি বা প্রবাসী বাড়িতে এলে তুমুল তর্ক বাধত বাবা-কাকা ও পিসিমাদের মধ্যে।

সেই তর্কের আবছা ছবি এখনও আমার চোখে ভাসে।

আর ছিল গানের হাওয়া। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে 'কাছাড়ের এক পরম সুন্দর চা-বাগানে অনবরত ফিরত রবীন্দ্রসংগীতের কলি। হয়ত ভুল সুর কিন্তু শোনা যেত ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী কিংবা গানের সুরের আসনখানি কিংবা এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী। ঠাকুরদা যেমন বাজাতেন সেতার, বাবা-কাকারা বাজাতেন এসরাজ। মনে পড়ে সন্ধ্যেবেলা জ্যোৎস্না ফিনিক দিয়ে নেমেছে বাড়ির উঠোনে, মা বিছিয়ে দিয়ে গেছেন শীতলপাটি। বাবা এসরাজটি তুলে ছড়িতে রজন লাগাতে না লাগাতেই ছোটকাকা পূবের ঘর থেকে গান ধরে ফেলেছেন—যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে। তারই রেশ টেনে ছোটপিসিমা বাবার কাছে বসে গলা মেলান—সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা বসন্তেরই সংগীতে। ওদিকে রান্নাঘরে মা ডালের কড়াইয়ে ফোঁড়ন দিতেই শব্দ উঠল হ্যাং, বেলতলায় পায়চারি-করা ঠাকুরদার খড়মের আওয়াজ, কাছারিঘরে বুকে বালিশ চেপে প্রবাসী পড়ছেন বড়কাকাবাবু, বড়কাকিমা তরকারি কুটে দিচ্ছেন মাকে, কাঁঠালগাছের পাতার শিরশিরানির ফাঁকে ঠাকুমা আর ঠানদি নাতি-নাতনিরের নিয়ে বারান্দায় বসে এবং সব ছাপিয়ে এসরাজের মিঠে সুরে বসন্তের গান মাতাল করে দিচ্ছে সারা বাড়িকে। রাত গভীর হয়। গান কখন থামে জানি না, ঘুমের মধ্যে কে কখন আমাকে খাইয়ে দিয়েছে জানি না, চোখ খুলতেই দেখি সামনে আর একটি উজ্জ্বল প্রভাত।

এক-একটি দিন, এক-একটি হীরের টুকরো। ভোর হতেই বাবা চলে গেছেন অফিসে। আমরা ছোটরা পড়তে বসেছি হাত মুখ ধুয়ে। মা-কাকিমা-ঠাকুরমা রান্নাঘরে। জলখাবার ব্যাপারটা চালু হয়নি তখনও। সকালবেলা সকলের খাবার সেদ্ধভাত। আলুসেদ্ধ, কুমড়ো সেদ্ধ, কাঁঠালবিচি সেদ্ধ।

আমার খেলাপড়া শুরু রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ দিয়ে। সেই সুদূরে বর্ণ পরিচয়ের বদলে সহজ পাঠ চালু করা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

বাবাই আনিয়েছিলেন। সহজ পাঠ ছাড়া বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মুখস্ত করাতেন বেদ-উপনিষদের সংস্কৃত শ্লোক। মানে বুঝতাম না, কিন্তু ঈশাবাস্যমিদং কিংবা অসতো মা সদগময় মন্ত্র আমাকে নিয়ে যেত এক রহস্যলোকে।

যা বলছিলাম। আমরা খেতে বসতে না বসতেই ঠাকুরদার ঘুম ভাঙতো। ওর সারা দিন-রাত ছিল ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। রাত বারোটায় ঘুম, সকাল আটটায় ঘুম ভাঙ্গা। বড়কাকা একটি ঘড়ি কিনে আনেন কলকাতা থেকে। ঘড়ির এলার্ম ছিল টুং টাং শব্দে ভূপালী রাগিণীর মিঠে সুর। সকাল ঠিক পৌনে সাতটায় ওই সুর বাজত। পুরো পনেরো মিনিট। বাজনা শেষ হতেই মা এসে মশারি তুলে দিতেন। তারপর সারাদিন চলল ঘড়ি মিলিয়ে চা-বিস্কুট পেঁপে মাগুর মাছের ঝোল পঞ্জিকা পাঠ দিবানিদ্রা কবিরাজি ওষুধ ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠাকুরদা জীবজন্তু ভালোবাসতেন। রোজ দুপুরে কাঁঠালপাতা জলে ভাল করে ধুয়ে একটি একটি করে বাড়ির গরু-ছাগলকে খাওয়াতেন। সন্ধেবেলা আসতেন ঠাকুরবাবু। ঠাকুরদার বন্ধু। আমরা বলতুম ভাইয়া। দুজনে মিলে নানা বিষয়ে গল্প হত। হিতবাদী কাগজের কথা, পুরোনো আমলের সাহেবদের কথা। ঘড়িতে আটটা বাজলেই ঠাকুরবাবু বিদায় নিতেন। ঠাকুরদা খেতে বসতেন।

ঠাকুরদা মারা যান ৮৪ বছর বয়সে, ১৯৪২ সালের গোড়ায়। মজার ব্যাপার এই, ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পরদিন সেই ঘড়িতে চাবি দিতে গিয়ে স্প্রীং ছিঁড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও ঘড়ি সারানো যায়নি।

দুপুরে আমরা খেতে বসতাম লাইন বেঁধে। বাবা কাকা পিসিরা, আমার খুড়তুতো পিসতুতো ভাইবোনেরা—আমি দাদামণি রাঙ্গাদা রুনু-ঝুনু-মনু সবাই। অনেক সময় এক থালায় সব খাবার নিয়ে মা বা কাকিমা 'কে খায় পায়রার ডিম, কে খায় হাঁসের ডিম' বলে বলে গোল হয়ে বসা আমাদের মত ছোটদের একসঙ্গে খাইয়ে দিতেন। একটু বড় হয়ে বাবার সঙ্গে এক থালায় খেয়েছি অনেকদিন। পরে রেখা জলি মঞ্জু মীরা পিনু টুনু নানু রাখীরা একসঙ্গে এক থালায় খেয়েছে।

মাদের খেতে খেতে বিকেল তিনটে হয়ে যেত। পাশের বাড়িতে ছিলেন ধনকাকি। তিনি তাঁর রান্না তরকারি ও ভাত নিয়ে চলে আসতেন। আমার মা, কাকিমা ও ধনকাকি এক থালায় একসঙ্গে বসে খেতেন। সেই খাওয়াটা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। পরে যখন ছোটকাকার বিয়ে হল, ছোট কাকিমা যোগ দিতেন সেই কমিউনিটি ঈটিংয়ে। আমার দুই কাকিমা ভাল গান গাইতেন। মেয়েলি গান চলত খেতে খেতে।

বিকেলবেলা বাবা আবার এসেছেন বাসায়। আবার সব জমজমাট। গান তর্ক কবিতা। ঠাকুরদা খড়ম পায়ে পায়চারি করছেন সামনের উঠোনে। বড় পিসিমা বা মেজ পিসিমা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে ঠাকুরদার পাশে পাশে হাঁটতেন। ঠাকুরমা গিয়েছেন সবজি খেতে আর মা সিঙ্গার মেশিনটি কোলে নিয়ে সেলাই করছেন আমাদের জামা প্যাণ্ট, বালিশের ওয়াড়, সেমিজ শায়া।

সন্ধেবেলা সারা হপ্তার বাজার এল রাজাবাজার থেকে! পাঠিয়েছেন ঠাকুরদার ভাগনে আমাদের জ্যাঠামশাই। আবার রান্নার তোড়জোড়। আবার একটি রাত্রি। ঘরে ঘরে লণ্ঠন। পড়ার আওয়াজ, ঝিঁঝি-পোকার ডাক, চৌকিদারদের হাঁক। পাশের বাসায় থাকে বিউটি হাবুল বঞ্জু বড় খুকু নান্নু। যেন এক পরিবার। বিউটি আমার ঠিক এক বছরের ছোট। আমরা দুজন সেই শৈশবের বন্ধু। মা-বাবার বড় আদরের ঝনু—আমার খুড়তুতো ভাই। আমি মা ও বাবার মাঝখানে ঘুমোতে চাই। কিন্তু ঝনু কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না আমাকে। সে দুজনের মাঝখানে থাকবে, আমি একপাশে। রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে বাবা বলেন নানা রকম গল্প। মা উপদেশ দেন, কী ভাবে মানুষ হতে হবে পড়াশোনা করে। এম এ পাশ করতে হবে। চা-বাগানে নয়, বড় চাকরি করতে হবে অন্যখানে। দুজনের কথায় ভালগোল পাকিয়ে ঝিম ধরে মাথায়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যায়। আবার একটি দিনের অবসান।

আমাদের বাড়িতে কাজ করত শম্ভু। শম্ভু বাউরি। আমাকে

ডাকত গঙ্গারাম। আমাকে কাঁধে নিয়ে শম্ভু ঘুরে বেড়াত এখানে ওখানে। লেবার লাইনে ওর বাড়ি থেকে পাকা আম এনে খাওয়াত। হাট থেকে কিনে এনে ছোট ছোট লিলি বিস্কুট—এক পয়সায় কুড়িটি—হাতে গুঁজে দিত। বোবা-কালা গোবরাকে দেখে ভয় পেতাম আমরা। কিন্তু বাবার সঙ্গে ওর ছিল বন্ধুত্ব। হাত নেড়ে নেড়ে বাবা ওর সঙ্গে কথা বলতেন। ও বুঝত। আর হাসত।

কয়েক ঘর বাঙালী বাবু—নানা জায়গা থেকে আসা—আর কয়েক শ' শ্রমিক পরিবার নিয়ে বিরাট সংসার এক একটি চা বাগান। আজ প্রায় দেড়শ বছর ধরে প্রায় একই রকম আছে। অন্য দশ জায়গার সঙ্গে তার মিল নেই। একেবারে আলাদা জগত, আলাদা কানুন।

এই জগতের মধ্যে রয়েছে তিনটি পক্ষ। প্রথম পক্ষ ম্যানেজার এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। সাহেব। অধিকাংশই স্কচ। বিরাট বাংলো বিপুল ক্ষমতা আর বিশাল ঘৃণা নিয়ে তাঁরা রাজত্ব করতেন এক একটি চা বাগানে। সেখানকার একচ্ছত্র সম্রাট তাঁরাই। মানুষ খুন করলেও পুলিশে খবর দেওয়ার সাহস ছিল না কারও। খবর দিলেও তদন্ত করার সাহস ছিল না পুলিশের। লাথি মেরে কুলির পিলে ফাটানোর গল্পও আজগুবি বা অসত্য নয়।

এঁরা চড়ে বেড়াতেন ঘোড়ায়। মোটর গাড়ি এল অনেক পরে। বড় নিঃসঙ্গ জীবন। দশ বারোটা চা বাগানের সাহেব মিলে সম্বল একটি ক্লাব। সেখানে গলফ মদ ব্রিজ খিস্তি। সপ্তাহে একদিন ছুটির বারে কুড়ি মাইল দূর শিলচরে গিয়ে আবার মদ ব্রিজ খিস্তি। এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কুলি পেটানো আর দেশে টাকা পাঠানো। কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে হেড অফিস আর লণ্ডনে বসে আছেন মালিক লর্ড ইঞ্চকেপ। তাঁরা মুনাফার টাকাটা পেলেই খুশি।

নারীসঙ্গবিবর্জিত সাহেবদের সংসারে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে যাঁরা থাকেন, তাঁদের বলে কুলিমেম। সবচেয়ে সুন্দর ও সুশ্রী কোন লেবারকন্যা আশ্রয় নেয় সাহেবদের বাংলোয়। সাহেব যখন দেশে ফিরে যান, দিয়ে যান কিছু জমিজমা, আসবাবপত্র ও একটি কি দুটি ছেলে।

লেবার-লাইনের ভিতরে হঠাৎ ফর্সা চেহারার কোন ছেলে বা মেয়ে দেখলে অবাক হবার কিছু নেই। ওরা চা বাগানের সমাজে গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় পক্ষ বাবুসমাজ। যেমন আমার বাবা, ঠাকুরদা। প্রধানত সিলেট, ময়মনসিং আর ত্রিপুরা জেলা থেকে এদের আগমন। সামান্য বিদ্যে নিয়ে চাকরি। কেউ কেরানিবাবু, কেউ টিলাবাবু, কেউ চা-ঘর বাবু, কেউ ডাক্তারবাবু। পনেরো কুড়িটি বাঙালী পরিবার। টিলা-বাবুদের কাজ চা গাছের টিলায় টিলায় আউটডোরে। তাদের কাজ কুলিদের তদারকি করা। একজন মরদ দফার—অর্থাৎ পুরুষদের আর একজন রেণ্ডি দফার—অর্থাৎ মেয়েদের।

এদের অবসর বিনোদনের জন্যে আছে তাস, আর মদ। কুলিদের ভাত মেরে ঘুস নিতে এরা প্রায় সবাই ওস্তাদ। মাইনে হয়ত কুড়ি টাকা, কিন্তু পাকা বাড়ি ওঠে শহরে আর বাড়িতে চলে বছরভর মহোৎসব। এরা সাহেবদের কাছে আভূমিপ্রণত এবং কুলিদের কাছে নবাব খাঞ্জা খাঁ। এদের মারের চোটে আর ধমকানিতে সবাই সন্ত্রস্ত। এদের অনেকেই সাহেবদের অত্যাচারের দোসর। ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমেরাই বাড়িতে মদের বদলে গান-বাজনার নেশা নিয়ে থাকেন, ছেলেমেয়েকে পড়াশোনার জন্যে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন।

তৃতীয় পক্ষ কুলি—বা লেবার। সংখ্যায় এরা বিপুল—এক একটি বাগানে দু-তিন হাজার। ব্রিটিশ আমলে যারা কুলি, স্বাধীনতার পর তারা লেবার। এক একটি চা বাগানের ক্ষুদ্র গণ্ডি কেটে এরা ছড়িয়ে আছে আসাম উত্তরবঙ্গে শ্রীহট্ট কাছাড় ত্রিপুরায়। এদেরই আত্মীয় গিয়েছে মরিসাস ফিজি ত্রিনিদাদ।

ভিন্ন ভিন্ন এলাকার ছিন্নমূল মানুষের একত্র সমাবেশে গড়ে উঠেছে যে বিচিত্র জগৎ সেই জগতের বাসিন্দারা নানা ভাষার লোক হলেও পরিচয় দেয় 'হিন্দুস্থানী' বলে, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে হিন্দীতে, পড়াশোনার জন্যে ভিড় করে হিন্দী ইস্কুলের বদলে বাংলা পাঠশালায় এবং আমার শৈশবের চা বাগান বড়থল দেওয়ান লাবকের শ্রমিকদের লিংগুয়া ফ্রাংকা হল রাঢ়ের কথ্য বাংলা। তার কারণ বড়থলের অধিকাংশ

শ্রমিক বীরভূম বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়ার। আর আছে কিছু ওড়িয়া, কিছু ছোটনাগপুরিয়া বা বিলাসপুরিয়া এবং কিছু তেলেগুভাষী। যেহেতু দাপট বেশি বাঙালী বাবুদের এবং বাবুদের বেশিরভাগ সিলেটী, তাই তারা নিজেদের চমৎকার শুদ্ধ বাংলাকে কুলি ভাষা বলে খারিজ করে দিয়ে সিলেটী বাংলা বলার চেষ্টা করে বাবুদের সঙ্গে।

দূর অতীত আর আদি নিবাসের চেহারা ওদের কাছে ঝাপসা। এক ঝুড়ি চা পাতা তুললে, এক ঝুড়ি টাকা মিলবে—এই আশ্বাসে এদের গরিব ঠাকুরদা এখানে এসেছিল, তারপর এখানেই বর্তমান, এখানেই ভবিষ্যৎ। এখানে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, বাঙালী নেই, ওড়িয়া নেই— সবাই লেবার। কেবল বিয়ের বেলায় জাত বিচার। বাউরির চাই বাউরি, কেওটের চাই কেওট। বাইরের পৃথিবী এদের কাছে অন্য গ্রহ। বাবার সঙ্গে লখিয়া শিলচর শহরে গিয়ে দু'চোখ কপালে তুলে বলেছিল—'আরি বাপ, পিরথিমি এত্তো বড়!'

এদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের বলা হত গিরমিটিয়া। ইংরেজি এগ্রিমেণ্ট শব্দের অপভ্রংশ। এগ্রিমেণ্টে যে সব লোক এখানে শ্রমিকের কাজ করতে আসত, তারাই গিরিমিটিয়া কুলি। এদের ধরে আনতেন আড়কাঠিবাবু। ইংরেজিরিক্রুটিং শব্দের অপভ্রংশ আড়কাঠি। এরাই মোটা টাকার কমিশনে ধরে আনতেন অতি দরিদ্র নিরক্ষর মানুষদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে। এসে কিন্তু দেখল, চা বাগানের জীবন টাকা দিয়ে মোড়া নয়। আমার ছোটবেলায় এদের রোজ মাহিনা ছিল পুরুষদের ছয় আনা, মেয়েদের তিন আনা। তাতেও ভাগ বসাতেন বাঙালী বাবুরা।

সাহেবদের যেমন বাংলো আর বাবুদের বাসা, শ্রমিকদের তেমনি লাইন—বস্তির মত সার সার খড়-বাঁশের ঘর। আলো নেই, জল নেই, কোনরকমে মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁই। ছেলেদের পরনে একখানা কানি, খালি গা। মেয়েদের গায়ে কাপড়—কোমর থেকে হাঁটু ঢাকা। বাচচা ছেলেরা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মিড়ি ব্লাউজ—ওরা বলে ঝোলা। ছোট ছেলেরা বিড়ি ফোঁকে, ডাংগুলি খেলে। আর বড়

হলেই রোজগারে নামে।

আমার শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সবুজ আর সবুজ। চারদিকে চা গাছের মেলা। দেড় কি দু হাত উঁচু সমান করে ছাঁটা। তার উপরে শিরিস আর মেডেলা গাছের সারি। মেডেলার ঝরা পাতা সার জোগায়, শিরিস ছায়া দেয়।

তখন হয়ত বেলা দুপুর। বারোটার ঘণ্টা বাজে বাজে। ঝুড়িতে পাতা—দুটি পাতা ও একটি কুড়ি—তুলছে মেয়েরা। হাত চলছে, মুখ চলছে। মাঝে মাঝে হাসির খিলখিল। তদারকিতে দাঁড়িয়ে আছে দু-চারজন সর্দার। কোদাল মারছে জোয়ান মরদেরা, তাড়া লাগাচ্ছেন খাকি হাফ প্যাণ্ট পরা টিলাবাবু। সর্দার হাতে চুন আর দোক্তা ঘসে ঘসে তৈরি করছে খৈনি। সেই খৈনি ছেলেমেয়ে সবার ঠোঁটে ঘুরছে।

চায়ের গাছের মিছিলের বুক চিরে সরু পিচের রাস্তা। সেই রাস্তায় সাহেব দেখলে ছাতা টাঙানো নিষেধ। বাগান-কানুনে অপরাধ। ছাতা খোলা লোক দেখলেই চাবুক মারবে সাহেব। ঘোড়ায় চড়ে সাহেব এলেই কিনার ঘেঁসে দাঁড়াতে হয়, বলতে হয়—সালাম হুজুর। সাহেব ফিরেও তাকাবে না।

আমার মনে পড়ছে মায়ের সঙ্গে খুব ছোটবেলায় মামাবাড়ি থেকে বড়থলে ফেরার ছবি। শিলচর থেকে লক্ষ্মীপুরের বাস। বাদরি খেয়া পেরিয়ে পয়লাপুল। এখানে নেমে বড়থল চার মাইল। হয় পালকি নয় হাঁটা। কিংবা ট্রলি। ট্রলি রেলের ট্রলির মতই খোলা মেলা, তবে লাইন ট্রামের মত। তার চার চাকার উপর কাঠের পাটাতন দেওয়া ট্রলি ঠেলে চারজন শ্রমিক। ট্রলিতেই বাবুদের বউঝিরা যান এ বাগান থেকে ও বাগান। চায়ের বাক্‌স যায় জাহাজঘাটায়।

দুপাশে চায়ের বাগান ফেলে ট্রলি চলেছে উজানে। ঝনাৎ ঝনাৎ গড় গড় গড়। বেরিয়ে গেল লাবকের পুল, দেওয়ানের ডাকঘর। তারপরেই চড়াই ঠেলতে ঠেলতে ট্রলিম্যান হয়রান। উৎরাই এলেই মজা। ট্রলির দ্রুত গতি। আমি আর মা কাঠের পাটাতনের উপর পাটি পেতে বসে আছি। পেছনে স্টীলের ট্রাংক, টিনের ফুলতোলা

স্যুটকেশ আর দড়িতে বাঁধা বিছানা। ট্রলির স্পীডে মাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছি। ট্রলিম্যান চারজনই হাঁটু মুড়ে বসে।

এসে গেছে টিনঘর। টিনঘরের পাশেই নুন-চা নিয়ে বসেছে বসন্ত পানিওয়ালা। কুলিকামিনরা মুড়ি-চা খেয়ে বেরিয়ে যায় কাজে। ফিরতে ফিরতে বিকেল। তার মাঝখানে ভর দুপুরে কোম্পানি ফ্রি দেয় নুন-চা। দুধ নেই চিনি নেই—লিকারের সঙ্গে গাদা গাদা নুন। বিরাট বিরাট ড্রামে নুন-চা তৈরি হয়। পানিওয়ালা বাঁকে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাজ থামিয়ে শ্রমিকরা ছুটে আসে এবং দু হাতের আঁজলা ভরে ঘটি থেকে ঢালা নুন-চা আকণ্ঠ পান করে। ওতেই হয় ক্ষুধা আর ক্লান্তির অবসান।

ট্রলি ঠেলছিল হীরালাল। টিনঘরের কাছে আসতেই মাকে বলল —ঠাকরান আইজ্ঞা, টুকুন পানি খেয়ে লি।

নুন-চা খেয়ে চারজনের মেজাজ খোশ। ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে খোশগল্প। হীরালালের বকবকানি—বুঝলেন, খোকাবাবু এই টিনঘরে রোজ বাঘ আসেক। সেদিন শনিচরার ছোট বেটার ঘাড়ে ঝাপ দিছিল সানঝের বেলা। বাঘটা উয়াকে লিব লিব করছে, অমুন সময় বাঘের চোখে পড়ল লরির হেডলাইট। শনিচরার বেটাকে ফেলে বাঘ পালাল। লরির ড্রাইভার উয়াকে গাড়িতে তুলে পাঠালেক সিকমান।

হাসপাতালকে ওরা বলে সিকমান; বুখার হলেই সিকমানে যায়। কথাটা বোধহয় ইংরেজি সিকম্যান-এর বিকৃতি।

তারপর একের পর এক বাঘের গল্প। বাঘ মানে চিতাবাঘ। গরু নিয়ে যায় হামেশা। মানুষ কামড়ানোর খবরও আসে মাঝে মাঝে। সন্ধেবেলা টিটাং নালায় কাপড় কাচছে মেয়েরা, এমন সময় কালো পাথরটার উপর পা চেপে চুকচুক জল খাচ্ছে বাঘ। মেয়েরা কাপড় ফেলে দিল দৌড়।—'হে-ই মা-লো, হে-ই বা-বা-লো, বাঘ খিয়ে লিলো লো—'

মেয়েদের চিৎকারে কুলি লাইন মাৎ। ছুটে এল জোয়ান-মরদেরা। খবর গেল বড় সাহেবের কাছে। সাহেবের বন্দুকে টোটা

পোরার আগেই বাঘ পগারপার।

রাজাবাজারে জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে বড়দা বা মেজদার সঙ্গে আমরা যখন হেঁটে বড়থল ফিরতাম, সন্ধে হলেই গা ছম-ছম করত। আর ফেউয়ের ডাক শুনলেই হাঁটু কাঁপত। বাঘ আসছে। রাতের বেলা ট্রলি চালালে একজন নজর রাখতেন দুদিকে—যদি বাঘ হঠাৎ লাফ দেয়।

বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে ট্রলি থামল বড়থল চা-ঘর আর অফিস-ঘরের সামনে। এক কোণে ধূপঘর, চায়ের পাতা প্রথমে মেলে দেওয়া হয় এখানকার ছায়াঘেরা তাকে-তাকে। সেখান থেকে রোলিং ঘর। ওখানে মেশিনে পাতা কুচি কুচি কেটে যায় রংঘরে। অর্থাৎ ফার্মেণ্টেশনে। তারপর ভাঁটিঘরে। অর্থাৎ পাতা ভাজতে। শেষমেষ সর্টিং। জাত বাছাই করে কোনটা পিকো, কোনটা ফেনিং, কোনটা সুসং। জাত বুঝে দর। এবং কদর। তৈরি চা বাক্স করে যায় শিলচর। সেখান থেকে স্টিমারে কলকাতা। কলকাতা থেকে জাহাজে লণ্ডন।

ট্রলি থামতেই চেনা গন্ধ। চায়ের পাতার পোড়া গন্ধ। উল্টো দিকে অফিসঘরে কেরানিবাবুরা মাথা গুঁজে লিখে চলেছেন। সকাল থেকে সন্ধে বাড়ি অফিস যাওয়া-আসা। আহার দিবানিদ্রার ফাঁকে ফাঁকে কাজ। ডানদিকের রাস্তা গেছে আউট গার্ডেন লেদিয়াছড়া আর বালাধনে। সোজা রাস্তা গেলেই নাচঘর। নাচঘরের পেছনে দুর্গাঘর, বাঁ পাশে হাসপাতাল, ডান পাশে নরেশদার ইসকুল—বাংলা পাঠশালা। পাঠশালার বাঁয়ে কলপ! অর্থাৎ ক্লাব। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে বাবুদের বাসা। মোহিনীবাবু, কালীবাবু, ক্ষিতীশবাবু, ঠাকুরবাবুদের খড়ের ঘর। তারপর অরবিন্দবাবু উমেশবাবু সুরেশবাবু জয়কুমারবাবুর বাসা। একগাদা চাকর আর একগাদা জায়গা নিয়ে অনেকগুলো খড়ের ঘর। বসার ঘর শোয়ার ঘর রান্নাঘর ঠাকুরঘর গোয়ালঘর—যে যত পার বানাও। আমাদের বাসা দুর্গাঘরের পেছনেই। সেখানেই বেলতলা। ওই বেলগাছের তলাতেই প্রতি পুজোয় হয় বিল্বষষ্ঠী। ঠাকুরদা আমাদের কুলগুরুকে তাঁর নিজের দেশ সিলেটের ইন্দেশ্বর থেকে নিয়ে আসেন

প্রতি বছর বাগানের পুজো করতে। ওঁরা আমাদের দশ পুরুষের কুলগুরু। আমরা বলি 'কর্তা।' ওঁরা কেউ এলে বাড়িতে মহোৎসব। ওঁরা ভোজন করেন, আমরা প্রসাদ পাই, ওঁরা আচমন করেন, আমরা ঘটি এগিয়ে দিই। ওঁরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি কাহিনী বলেন, আমরা ছোটরা মুগ্ধ হয়ে শুনি।

আর আসেন কৈলাস ঠাকুর। প্রতিমা গড়েন। দুর্গামায়ের চোখ কৈলাস ঠাকুরের হাতে দারুন খোলে। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতাম, মাটির তাল তাঁর হাতে কী করে অপরূপ জগজ্জননী হয়ে যান। তখনই একটা শব্দ শুনি—গর্জন তেল। আমরা অপেক্ষা করতাম কখন গর্জন তেল লেগে দুর্গাঠাকুর ঝলমলিয়ে উঠবেন।

দুর্গাপুজোয় অতিথি হন আরো কয়েকজন। গানের ও নাচের মাস্টার, মোশন মাস্টার ও ক্ল্যারিওনেট করনেট বাজানেওয়ালা। নাচঘরে প্রতি বছর হয় বাংলা যাত্রাগান—কর্ণার্জুন লীলাবসান,. রক্তরবি রঘুবীর ইত্যাদি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা থেকে আসেন হিন্দু গানের মাস্টার আর মুসলমান নাগার্চি বাজিয়েরা। মালু মিঞার কথা আমার এখনও মনে আছে। আমাদের বাড়িতেই খেতেন। মা উঠোনে একসঙ্গে সব খাবার থালায় বাটিতে সাজিয়ে দিতেন। মালু মিঞা খেয়েদেয়ে নিজের বাসন নিজেই মেজে রেখে দিতেন। সেই মালু মিঞা যখন ক্ল্যারিওনেট বা করনেট ফুঁ দিয়ে স্টেজে আসতেন, আমাদের চোখে তিনি অন্য মানুষ।

শুরুর কনসার্ট. আর যুদ্ধের বাজনার ভার বাঁশিওয়ালার উপর মোশন মাস্টার ছেলে-সখীদের নাচ শেখান, গানের মাস্টার হারমোনিয়াম নিয়ে গানে সুর দেন। তার মধ্যে দু'একটি গান মনে পড়ছে—'ওরে ও কপালপোড়া বর, কপালে তোর ঘুন ধরেছে, জুটলনাকো বাসরঘর', কিংবা 'শালবনে ফুল, দুলছে দোদুল, গাগরী ভরনে চল্ যাই।

অভিনয় হয় বাবু কুলিরা মিলে। ভাল ভাল পার্ট বাবুদের। কুলিদের ছোটখাট। মাস তিন চলে রিহার্সাল—বাগানী ভাষায় তার নাম তালিম। অভিনয়ের দিন নাচঘরে পেট্রোম্যাক্স জ্বলে।

তন দিকে চাটাইয়ের উপর বসে কুলিরা। আর একদিকে বাবুদের জন্যে বেঞ্চি। আর বাবুদের বাড়ির বউ-ঝিদের জন্যে চিকের আড়াল। মা বা কাকিমার কোলে বসে ওই চিকের আড়াল থেকেই আমার প্রথম যাত্রাগান দেখা। একটু বড় হলেই আমাদের জায়গা হয় স্টেজের গায়ে শাদা চাদর বিছানো জায়গায়। আমি বিউটি হাবুল রেণু সিদ্ধি ছানা—প্রায় সমবয়সীরা একসঙ্গে বসি। হারমোনিয়াম আর বাঁয়া-তবলা আসতেই রাত দশটা। ঘুমে যখন চোখ ঝাপসা, তখন পাশে বসা দাদামণি বা রাঙাদা বা সুন্দরদাকে বলি, 'আমি ঘুমোলাম, যুদ্ধ এলে তুলে দিও।' আধো ঘুম আর আধো জাগরণের মধ্যে শুনি যাত্রার দু-চারটে কথা আর সর্দারদের চিৎকার—হাল্লা মৎ করো।

আমরা সেদিন খুব সেজেগুজে থাকি। পুজোর নতুন জামা-প্যাণ্ট। জুতো-মোজা। রাত্রে বাবা বা মা আমাদের সকলের গায়ে একটু কস্তুরী বা অগুরু মাখিয়ে দেন। ঠাকুরদা বা জ্যাঠামশায়ের কাছে থেকে পাওয়া এক পয়সা বা দু-পয়সা দিয়ে লুকিয়ে পানও খাই। জেগে থাকলে বাড়ি ফেরার মুখে মুখটা ধুয়ে নিই। মা পান-খাওয়া ঠোঁট দেখতে পেলে প্রচণ্ড মারবেন।

এই যাত্রাকে বলা হয় গান। অপেরা পার্টি তো, তাই গান। সবাই বলে, চল গান দেখে আসি। এইদিন শ্রমিক-মেয়েরা দারুন সাজে। মাথায় গন্ধ তেল, মুখে পান, গায়ে রূপোর গয়না আর লাল বা সবুজ শাড়ি। ছেলেদের গায়েও নতুন জামা। হাতে বাঁধা লাল রুমাল, মাথায় তেলচুকচুক টেরি। কারও হাতে টর্চবাতি। গান শেষ হতে হতে রাত কাবার। সাহেবরাও কখনো-সখনো আসেন। বেতের চেয়ারে খানিকক্ষণ বসে চলে যান। ওঁদের জন্যে পালা থামিয়ে আগে থেকে তৈরি করা কমিক দেখানো হয়। কমিক মানেই ভাঁড়ামি।

দুর্গাপুজোয় যোগ দেয় হিন্দু-মুসলমান সবাই। একবার এক মুসলমান শ্রমিকের কাছ থেকে পুজোর চাঁদা কাটা হয়নি। সে বাবার কাছে ছুটে এসে বলে—হে-ই কিরানিবাবু, ইটা কী করলি? মুসলমান

হইছি বলে কি দুর্গামাঈয়ের চাঁদা দিব নাই? আসছে হপ্তার তলব (মাইনে) থেকে টাকা কেটে লিবি।'

শনিবার শনিবার হপ্তা তলব। সাহেব অফিসঘরের সামনে টাকা নিয়ে বসেন। কেরানিবাবু নাম ডাকেন, কুলিরা লাইন বেঁধে সাত-দিনের মাইনে নিয়ে যায়। কাছেই বসে তলবসাল—অর্থাৎ ছোট হাট। সেখানে আসে আনাজপাতি মাছ চাল ডাল বিস্কুট জিবেগজা লজঞ্চুস। ঠাকুরদার জিওল মাছ আর খড়ম-বিস্কুট এখানেই কেনা হয়। ঠাকুরদা পেঁপে আর জিওল মাছের ঝোল বছরের পর বছর খেয়ে যাচ্ছেন। সকালে দুধের সঙ্গে বিস্কুট। কুলিদের হপ্তা রোজগার একদিনেই কাবার হয়ে যায়। বাকি যা থাকে, তাই দিয়ে হাঁড়িয়া খেয়ে ছেলে-মেয়ে জোয়ান-বুড়ো সবাই লাইনে চেঁচামেচি লাগায়।

রবিবার ছুটিরার। সেদিন ক্লাব ঘরে গিয়ে তাস বা ক্যারাম খেলা। ফুটবল খেলা হয় বর্ষাকালে। বাগানে বাগানে কম্পিটিশন। ভালো প্লেসে খেলেন বাবুরা, কুলিরা হাফব্যাকট্যাক। সাহেব খেলোয়াড় হলে তিনিও যোগ দেন। যে ভাল হেড করতে পারে আর স্লিপ কাটতে পারে তার খুব কদর। সে-সময় ড্রিবলিংকে আমরা বলতুম ক্যারি।

আমাদের বাসার পেছন দিকে বটতলার বাজার। বুধবার দুপুরে বসে। ঠাকুরদার হাত ধরে আমিও যাই। যেতে-আসতে অন্তত একশ'বার—বুড়াবাবু আইজ্ঞা, নমস্কার আইজ্ঞা। বটতলার অন্যদিকে নয়ানরামের দোকান। সবেধন নীলমণি। আসে মণিপুরী মুড়িওয়ালী। গায়ে বুকঢাকা হাঁটুঢাকা ফানেক। কানে চাঁপা ফুল, কপালে রসকলি। আমরা ওদের বলি মিতিন। কামরাঙা গাছের তলায় বসেন সতীশরাম। তাকে সবাই বলে ঠাকুর। তিনি দাড়ি কামান, চুল কাটেন।

শ্রমিকদের নামের ধারা অদ্ভুত। বাগানে চারজন শম্ভু থাকে তো সংখ্যা ধরে ধরে নাম। তেসরা শম্ভু, পয়লা শম্ভু ইত্যাদি। বার দিয়েও নাম রাখার রেওয়াজ আছে। যে-বারে জন্ম সেই বারে নাম।—রবিয়া

সোমরা, মঙ্গল, বুধু, বৃহস্পতিয়া, শুক্রা, শনিয়া বা শনিচরা। মেয়েদের এতোয়ারী, শনিচরী। আবার অনেক সময় দেখা যায়, ছোটবেলা যার নাম নটিয়া, কাজে নাম লেখাবার সময় সে গোবিন্দ। মরদ দফার বাবু হয়ত জিজ্ঞেস করলেন—কী নাম লিখব তোর? নটিয়ার জবাব—একটা কিছু দিয়ে দিন বাবু। বাবুর পছন্দ গোবিন্দ। সেই থেকে নটিয়া হল গোবিন্দ।

দুর্গাপুজা ছাড়া বড় পরব দোল। শ্রমিকরা বলে ফাগুয়া। ফাগুয়ার আগে-আগে বাউরিদের টুসু পরব। ওই সময় নতুন নতুন গান বাঁধে ওরা। মেয়েরা বাবুদের বাসায় এসে বখশিস নেয় আর গায়—

বাবুদের গেড়া গেড়া পিঠা লো,
গেড়া গেড়া পিঠা,
ও পিঠা, খাইতে লাগে মিঠা লো,
খাইতে লাগে মিঠা।

অন্য বাসায় গিয়ে ওরা ধরবে অন্য গান। গানের সঙ্গে সঙ্গে হাসির ঝিলিক।—

হায় মামা, সাদি কর
সরষা ফুলের সরুয়া গাঁথুনি।
মামী হবে নাচুনি—

চমৎকার সুর। শুনলে মনে হবে কাছাড়ের জঙ্গলে নয়, পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার কোন গ্রামে হাজির হয়েছি।

দুর্গাপুজা ফাগুয়া আর টুসু পরব ছাড়া তেলেগুরা করে মনসা পুজো আর ওড়িয়ারা করে রামায়ণ গান। চামর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ আর মুখে—রসবতী, তু কুয়াড়ে যাউছি। পদাবলী কীর্তন আর কুর্মীদের নাচ দেখতেও ভিড় জমে।

নিস্তরঙ্গ জীবনের মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ বড় সংবাদ হয়ে ওঠে নানা রকমের ব্যাভিচারের ঘটনা। কেরানিবাবুর কাছে নালিশ—

ছয় লম্বরের দুখু দুই লম্বরের রতুকে লিয়ে ভাগল আইজ্ঞা।

কোন্ দুখু? চুন্নুর বেটা?

হ, আইজ্ঞা ?

আর রতু ?

মতিরামের বিটি আইজ্ঞা।

বসল দরবার। ত্বু' পক্ষের মা-বাবার বক্তব্য শোনা হল সর্দার চৌকিদারের সামনে। গালাগালি করলেন তু' পক্ষকে। আসামীরা ফিরে এলে তু-চারটা চড়-চাপড় পড়ল ওদের গায়ে। আবার সব চুপ, আবার সব ঠাণ্ডা।

একবার মিস্ত্রি সাহেব মিঃ কর্কের বাংলোয় বড় ঘটনা ঘটে গেল। সতীশ ঠাকুর চুল কাটতে বসেছেন, উল্টোদিকে সাহেব দাড়ি কামাবার ক্ষুরটা টেনে নিয়ে নিজের গলায় দিল কোপ। পরিষ্কার আত্মহত্যা। এই নিয়ে বছরভর সারা বাগানে হৈ-চৈ। নানা রকম কথাবার্তা। তারপর বাগান আবার যে-কে সেই।

বড় অপমানের জীবন শ্রমিকদের। হাড়ভাঙা খাটুনির বদলে সামান্য পারিশ্রমিক। তাতে পেট ভরে না। তাছাড়া আছে লাথি-চড় গালিগালাজ। অপমান অত্যাচার সয়ে সয়ে ওরা কাঠ। প্রতিকারের কোন রাস্তা নেই। কেউ কেউ ভাবে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যাবে কোথায় ? বাঁকুড়া কটক বিলাসপুরের স্মৃতি আর নেই।

কিন্তু বাবুরা পালাতে পারেন। নিজেরা না পারুন, ছেলেদের দূরে অন্য চাকরিতে পাঠিয়ে দেন, অন্য জায়গায় লেখাপড়া শেখান। আমার বয়স যখন ছয়, মা একহাত ঘোমটায় মুখ ঢেকে ঠাকুরদাকে বললেন, 'ঠাকুরকর্তা, ভাবছি ওকে ওর মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেব। ওইখানেই পাঠশালায় প্রথম মানে ভরতি হবে। তারপর ম্যাট্রিক। গ্রামেই হাই ইস্কুল।'

ঠাকুরদা যতদিন আছেন, বাবার কোন ভূমিকা নেই ; তাই ঠাকুরদার কাছেই মায়ের দরবার। ঠাকুরদা খল থেকে মকরধ্বজটা চেটেপুটে খেয়ে বললেন, না গো বড় বউ, আমি মারা যাবার পরে ওকে মামাবাড়ির ইস্কুলে পাঠিয়ো।

মা চলে এলেন। আর কথা বলার সাহস নেই। এবার দরবার

ঠাকুরমার কাছে। মা কিছুতেই আমাকে বাগানের পরিবেশে রাখবেন না। একমাত্র সন্তান, তবু তাকে মানুষ করতে হবে বাইরে পাঠিয়ে। ঠাকুরমা মার কথা শুনে গেলেন ঠাকুরদার কাছে। স্ত্রীর কাছে সব স্বামীই পরাজিত। আমার মামাবাড়ি চলে যাওয়ার অনুমতি মিলল।

হঠাৎ একদিন স্বর্গ থেকে বিদায়। আনন্দের হাট থেকে অন্য জগতে যাত্রা। মা সুটকেশ সাজিয়ে দিলেন। বাবা একখানা খাতা ঢুকিয়ে দিলেন সুটকেশে। একশটা সংস্কৃত শ্লোক নিজের হাতে লেখা। বললেন, রোজ সকালে অন্তত একটি শ্লোক পড়িস। ঠাকুরদা ঠাকুরমা, ঠানদি বাবা কাকিমা পিসিমা ও কাকাদের প্রণাম করলাম। মা-র কাছে আসতেই বুকটা ধক করে উঠল। কাঁদলাম। মা-র চোখে জল নেই। আমার কড়ে আঙুলটায় ছোট্ট একটা কামড় দিয়ে মাথায় কুলদেবতা রাজরাজেশ্বরের আশীর্বাদ ছোঁয়ালেন। শম্ভুর কাঁধে উঠলাম আমি। চার মাইল দূর পয়লাপুল নিয়ে আমায় বাসে তুলে দেবে। ওর হাতে আমার সুটকেশ। তার ভিতরে স্লেট-পেনসিল শ্লোকের খাতা সহজ পাঠ মায়ের তৈরি প্যান্ট-জামা। একটা তোয়ালে। আমি মামাবাড়ি চলেছি পড়তে। সঙ্গে বাবা। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি পিসিমা ঠাকুরমা বাসার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মা বোধহয় আবার রান্নাঘরে। আর পেছন ফিরে তাকালাম না। আমার চোখ ভেঙে জল পড়তে লাগল শম্ভুর ঝাঁকড়া চুলে।

আচমকা হর্নের আওয়াজে সব স্মৃতি খানখান হয়ে গেল। আবার ১৯৭৮ সাল। ছেলে সুমিত ঘুরছিল এদিক-ওদিকে। শিলচরে ফিরে যাওয়ার জন্যে মোটরের হর্ন বাজিয়ে তাড়া লাগাচ্ছে। আমি বললাম, যাচ্ছি, তার আগে এদিকে একটু আয়।

সুমিত দুর্গাঘরের সামনে দাঁড়াল। বললাম, ওই দেখ, তোর চেয়ে ছ' বছরের ছোট, অথচ তোরই মত একটি ছেলে একজনের কাঁধে চড়ে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। পাশে আমারই মতো একজন। চিনিস ওদের?

সুমিত অবাক।—'তোমার কী হয়েছে বলো তো বাবা? এখানে

এসে কেমন যেন হয়ে গেছ। আমি সামনে চা-গাছ আর চা-ঘরের উঁচু বাড়িটা ছাড়া আর তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেখতে পাসনি তো?'—আমি বললাম—'ভালোই হয়েছে। নইলে বড় কষ্ট পেতিস্। তুই কেন কষ্ট পাবি। চল এগিয়ে যাই।'

।। দুই ।।

সুমিতকে না হয় কাটানো গেল, কিন্তু আমার স্মৃতিকে কাটান দিই কী করে। এই মুহূর্তে এই আমি তো সেই আমি। আমি আবার পেছনে চলে যাই। সুমিত সুনন্দা কেউ আমার পাশে আর নেই।

মনে পড়ল কান্নাটা তখন থেকেই গলায় দলা পাকাচ্ছিল। বাবা শিলচর পর্যন্ত এসে আমাকে সঁপে দিলেন ধনকাকা ও ধনকাকিমার হাতে। ধনকাকিমার কাছ থেকে ঠাকুরমামার কোলে যেতেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। ঠাকুরমামা আদরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সেই স্বপ্নের চা-বাগান, আমার বাবা-ঠাকুরদার কর্মস্থল বড়থল ছাড়লাম মাত্র ছ'বছর বয়সে। পড়াশোনার তাগিদে চলেছি মামাবাড়িতে। বাসে শিলচর। শিলচর থেকে ট্রেনে আঠারো মাইল দূরে রূপসীবাড়ি। আমার মামার বাড়ি শ্রীগৌরী গ্রামের রেলস্টেশন। এদিকে শিলচর, ওদিকে করিমগঞ্জ, মাঝখানে রূপসীবাড়ি। বদরপুর জংশনের লাগোয়া। খড়ের চালে ছাওয়া স্টেশনের পেছনে শ্যাওড়া গাছ। সেই গাছের পুজো দিয়ে গাঁয়ের মেয়েরা করে রূপসীব্রত। ওই রূপসী ঠাকরুনের নামেই রূপসীবাড়ি।

ধনকাকা ধনকাকিমা যাচ্ছিলেন নিজেদের বাড়িতে আরো দূরে। রূপসীবাড়িতে রাতের অন্ধকারে করিমগঞ্জ যাবার ট্রেন থামতেই লণ্ঠনহাতে ঠাকুরমামা চেঁচিয়ে ডাকলেন আমার নাম ধরে। 'এই যে—এই যে' বলে জবাব দিতেই ঠাকুরমামা এগিয়ে গিয়ে কামরা থেকে

আমাকে তুলে নিলেন, আর বড়থলের স্বর্গ থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়ার অভিমানে এতক্ষণ জমা কান্না ঠাকুরমামার পিঠ ভেজাতে লাগল।

ট্রেন চলে গেল। আমার কান্না আরো বাড়তে লাগল। ঠাকুরমামা আমাকে সান্ত্বনা দেন আর রেল লাইন ধরে বাড়ির দিকে এগোন। গা ছমছম অন্ধকার। পিছনে একহাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে আমার ফুলতোলা টিনের সুটকেশ হাতে দাদামশায়ের এক রায়ত।

রেললাইন বরাবর হাঁটতে হাঁটতে এক ফার্লং দূরেই নেমে পড়লাম মেঠো রাস্তায়। একটু এগোলেই মামাবাড়ি। ঠাকুরমামার কোল থেকে দিদিমার কোলে। এগিয়ে এলেন দাদামশাই, ঠাকুরমামী সোনামামা। আমার মামাতো ভাইবোন ইলা কান্তি তুষার তখন ঘুমে। পাশের ঘর থেকে কুপিবাতি হাতে এলেন মা'র বিধবা কাকিমা,— আমার দিদিমণি। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকাই। আগে আরো তিন চার বার মা'র সঙ্গে বেড়াতে এসেছি মামাবাড়ি। তার স্মৃতি অস্পষ্ট। শুধু মনে আছে ১৯৩০/৩১ সালে আমার বয়স যখন তিন, দাদামশাই আমাকে বানিয়ে দিয়েছিলেন খদ্দরের পাঞ্জাবি-প্যান্ট, হাতে দিয়েছিলেন কংগ্রেসী পতাকা। সেই পোশাকে পতাকা হাতে খুব ঘুরে বেড়াতাম। কেউ জিগগেস করলে দাদামশায়ের শেখানো বুলিতে বলতাম—'লবণ বানাতে চলেছি।' তখন চলছে গান্ধীজীর লবণ-সত্যাগ্রহের যুগ। দাদামশাই ১৯২১ সাল থেকে ঘোর স্বদেশী। বাড়িতে সব খদ্দর। ১৯২১ সালে কলকাতা থেকে বানিয়ে আনা সব বিলিতি কাপড়ের পোশাক পুড়িয়েছিলেন পুকুর পাড়ে। আইন অমান্য করে জেলে যান পরের বছর।

বেড়াতে আসার সেইসব স্মৃতি বড় মধুর। কিন্তু মাত্র ছ' বছর বয়সে মা বাবা কাকা পিসি ঠাকুরদা ঠাকুরমার সুখের সংসার ছেড়ে পড়াশোনার জন্যে মামা-বাড়িতে চলে আসা অন্য জিনিস। দিদিমা আমার চোখের জল মুছিয়ে খাইয়ে দিলেন নিজের হাতে। তারপর শুইয়ে দিলেন তাঁর নিজের বিছানায়, পাশের জায়গাটিতে। ওই একই জায়গায় আমার

রাত কেটেছে সেদিন থেকে পুরো দশ বছর। প্রথম রাতে মা-বাবার প্রতি অভিমানে চোখের জলে বালিশ ভিজেছে আমার অজান্তে ঘুমের মধ্যে। মামাবাড়িতে প্রকাশ্যে সেই আমার প্রথম কান্না, সেই আমার শেষ কান্না।

ছোটখাট জমিদার দাদামশাই। যত টাকা, তার চেয়ে বেশি প্রতাপ। বারবেল-মুগুর-ভাঁজা পেটা শরীর, টকটকে ফর্সা গায়ের রং। এমনিতে সৌখীন সুপুরুষ, কিন্তু বদরাগী এক নম্বরের। নিজে যেমন ছিমছাম, বিরাট বাড়িখানাও তেমনি। গোলাপ বাগান, সব্জি খেত, বাইরের উঠোন, ভিতরের উঠোন সব ঝকঝক করছে দাদামশায়ের হাতের গুণে। ঠাকুরমামা ও সোনামামা তখনও বিশেষ কোন কাজ করেন না। করার দরকারও নেই। ঘোড়ায় চড়ে শিলচর করিমগঞ্জ যান, বন্দুক হাতে পাখি শিকার করেন, ভিতর বাড়িতে লুকিয়ে ফুড়ুক-ফুড়ুক তামাক খান। মণ মণ ধান আসে। ভাঁড়ারে জমে। বিক্রি হয় সারা বছর। হাতে টাকা, বাড়িতে খাবার, নিশ্চিন্তে সংসার চলে।

তবে এ বাড়িতে খাওয়া দাওয়া অন্য রকম, কথাবার্তা অন্য রকম, চালচলন অন্য রকম। আমাদের চা বাগানের বাড়ি থেকে একেবারে আলাদা। এখানে গান বাজনা সাহিত্যের আলোচনা নেই, কেবল অমুককে ধমক, তমুককে জুতোপেটা। পুবের ঘরে ঝোলে ঝাড়লণ্ঠন, টঙ্গী ঘরে পাল্কি, তার পিছনে ঘোড়ার আস্তাবল। প্যারালাল বারে মামারা করেন ব্যায়াম, পুকুরপাড় দিয়ে জলটঙ্গীঘরের তলায় কাউকে দেখলেই বাজখাই গলায় দাদামশাই হাঁক পাড়েন—'কে রে?' শুনে পথিকের তো বটেই, আমারও পিলে চমকে যায়। এ কোথায় এলাম? এরা তো আমার বাবা কাকা ঠাকুরদার মতো ঠাণ্ডা গলায় কথা বলেন না?

কয়েক দিন পরেই ভর্তি হয়ে গেলাম সারদা চৌধুরীর পাঠশালায়। ঠাকুরমামা আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। বাঁশগাছ, সুপারি গাছের ফাঁক দিয়ে সরু রাস্তা। চাম গাছের সাঁকো পেরোই। বিপিন ধোপার মা এগিয়ে এসে আদর করে। রমনবাবুর বৈঠকখানা, পাল-

চৌধুরীদের বাড়ি পেরিয়ে লোক্যাল বোর্ডের সড়কের কাছে হাজির হই। পুকুর পাড়ে খড়ের ঘর দু'খানা। ওটাই পাঠশালা। দূর থেকেই শুনলাম হুম হুম শব্দ। যেন মৌমাছিদের সমবেত গুঞ্জন। পাঠশালার কাছে গিয়ে টের পাই ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে। পাঠশালায় নিচু ক্লাসে বসার জন্যে বাঁশের চাটাই। শ্লেট পেনসিল আছে, সেই সঙ্গে সবার হাতে আছে তেঁতুল বীচির পুঁটলি। তেঁতুল বীচি সাজিয়ে বর্ণপরিচয়ের পাট তখনও উঠে যায় নি। কেউ কেউ আবার বাইরে জমানো বালিতে আঙুল বুলিয়ে লিখছে অ আ ক খ। হাতে খড়ির পর প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ। তারপর প্রথম মান দ্বিতীয় মান তৃতীয় মান। এই হল সেকালের পাঠশালার শ্রেণীবিভাগ। উপরের ক্লাসে বেঞ্চি আছে, তবে ডেস্ক নেই। বই খাতা রাখতে হয় পাশে।

খানিক বাদে এলেন বড় মাস্টার। ঠাকুরমামা বললেন, "সারদা-দাদা, শৈবর ছেলে, আমার ভাইগনা। আপনার কাছে রাখিয়া গেলাম।" শৈবলিনী আমার মায়ের নাম। শৈব ডাক নাম। বড় মাস্টার আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, "ক্ষিতীশ, তুমার ভাইগ্‌না তো আমারও ভাইগ্‌না। কুনো চিন্তা করিও না, যাও।"

আমি ভর্তি হয়ে গেলাম প্রথম মানে। শুরু হল আমার নতুন জীবন। খুব ভোরে উঠতে হয় এ বাড়িতে। উঠেই সাজি হাতে বেরোই পুজোর ফুল তুলতে। কোন্ ফুল বাসি, পুজোয় লাগে না, কোন্ ফুল মাটিতে পড়ে থাকলেও পুজোয় লাগে দাদামশাই চিনিয়ে দিলেন। বিরাট বাড়ি আমার মামাদের। সার সার ঘর। টিনের চাল, কাঠের দেয়াল। দালান একটিই—সেটা ঠাকুরঘর। গাছপালা ফলফুলে জমজমাট। অর্জুন অশত্থ, অশোক আম জাম কামরাঙা লটকান সুপুরি বাঁশ কলা বেত গাব ডুমুর ছেয়ে আছে চারদিক। বাহির বাড়িতে গোলাপ ফুলের বিরাট বাগান, অন্য দিকে অন্য ফুল। পুকুরের একপাশে সব্জি, অন্য পাশে আখের খেত। বৈঠকখানা ঘরের পিছনে ভিতরের উঠোন। এই উঠোনের পিছনে শোবার ঘর রান্নাঘর। ধানের মরাই গোয়ালঘর আস্তাবল বাইরে। ধোপা নাপিত

কাজের লোকদের বাড়ি আশেপাশে। ওরা বিনা খাজনায় পায় থাকার জমি, ধানের জমি। তার বদলে আসতে হয় যখন তখন ডাক পড়লেই। কাপড় কাচে বিপিন আর বিপুল। রবিবার রবিবার চুল কাটতে আসেন আবলুস কাঠের মত চৈতন্য দাদী। তিনি না এলে তার ছেলে মাখন পুতি। দাদা থেকে দাদী, পুত্র বা পুত থেকে পুতি। ধমকে ধমকে আমাদের কদমছাঁট দিতেন। দিদিমা দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন চুল ঠিক ঠিক ছোট হল কিনা। অন্যদিন গায়ে সরষের তেল মেখে পুকুরে ঝাঁপ দিতাম। দেরি হলেই দিদিমা হাঁক দিতেন— "ভাটিয়াল গাড়ি যে গেল গিয়া, অখনও ইস্কুলে গেলায় না।" কিংবা বলতেন, "রইদ উঠানো নামি গেছে, তাড়াতাড়ি পাঠশালা যাও।" রইদ মানে রোদ।

তখন ঘনঘন ঘড়ি দেখার রেওয়াজ ছিল না। দাদামশায়ের একটা পকেটওয়াচ ছিল এবং সেটাই ছিল সেই তল্লাটের একমাত্র ঘড়ি। কিন্তু আমরা সবাই দিন বিভাগ করতাম রোদের ওঠানামা এবং ট্রেনের আসা যাওয়া দিয়ে। আপ ট্রেন উজান গাড়ি, ডাউন ট্রেন ভাটিয়াল গাড়ি। রূপসীবাড়ি দিয়ে দিনে ছ'খানা গাড়ি যাতায়াত করত। রেল গাড়ির, ওই উজান-ভাটি দিয়ে আমরা সময়ের হিসাব করতাম। আমরা সে সময় ইংরেজির বদলে কত সুন্দর সুন্দর বাংলাও বলতাম। আপ ডাউনের বদলে যেমন উজান-ভাটি, তেমনি ব্লটিং পেপার না বলে বলতাম চুষ কাগজ। পেন-নাইফকে বলতাম কলম ত্রাস, মেল ট্রেনকে বলতাম ডাকগাড়ি।

আমার ইস্কুলে যাওয়ার পোশাক একালের ছেলেরা ভাবতেই পারবে না। অবশ্যই খালি পা। অসুখ বিসুখ না হলে জুতো পরে বাইরে বেরোয় কে? জুতো পায়ে ইস্কুলে গেলে ছেলেরা বলে, 'জ্বর নাকি? পরনে মায়ের হাতে তৈরি প্যান্ট। প্যান্ট না বলে ওকে ইজের বলাই' ভাল। ইজেরের উপর পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি তার কারণ দর্জি হিসেবে মা তখনও শার্ট তৈরি শেখেন নি। আমি তখন ভীষণ রোগা। যেন খ্যাংরা কাঠির উপর বসানো গোল আলু। মাথায় কদম ছাঁট

চুল। চুল একটু বাড়লেই দিদিমার নির্দেশে ছোট হয়ে যায়। গেঞ্জির বদলে ভিতরে পরতাম ঢোলামাপের নিমা।

পাঠশালায় বইখাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল অন্য রকমের। সাধারণ রুমালের চারগুণ সাইজের চৌকো কাপড়ের এক কোণে সেলাই করা লম্বা ফিতে। বইখাতা সেই কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ওই ফিতে দিয়ে বেঁধে নিতাম। ওই কাপড়কে আমরা বলতাম বস্তনি। লাল কালি আর কালো কালির দোয়াত নিয়ে যেতাম ছেঁড়াকাপড় বা পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি ছোট্ট শিকেয় ঝুলিয়ে। দোকান থেকে কালি বা খাতা কেনার রেওয়াজ তখন ছিল না। আমরা লাল বা কালো বড়ি এনে নিজেই কালি তৈরি করতাম। অনেক সময় হরতুকি পুড়িয়ে বাড়িতেও কালি তৈরি করেছি। কত রকম সাইজের মাটির দোয়াতই না পাওয়া যেত বাজারে। দোয়াতে দোয়াতে লাল কালো সবুজ কালি ভর্তি করে রাখা ছিল আনন্দের ব্যাপার। ফাউন্টেন পেন দূরে থাক, গোড়ায় নিবের কলম দিয়ে লেখা নিষেধ ছিল। তাতে নাকি হাতের লেখা খারাপ হয়। আমরা পাখির পালকের বা খাগের কলম তৈরি করতাম নিজে। তাই দিয়ে লিখতাম। ফুলস্কেপ কাগজ কিনে খাতা বানাতাম প্রচণ্ড উৎসাহে। পাতলা রঙিন কাগজ কিনে এনে মলাট দিতাম প্রত্যেকটি খাতায় আঠা লাগিয়ে। খাতায় মলাট দিয়ে লিখতাম, দিস খাতা বিলংস টু—। লেই দিয়ে আঠা তৈরির দায়িত্বও ছিল আমাদের। ফাউন্টেন পেন প্রথম ব্যবহার করি ম্যাট্রিক পাশের পর। আমার বড় কাকা কলকাতায় পার্কার ব্লু ডায়মণ্ড কিনে দিয়েছিলেন। তার আগে ক্লাস নাইনে 'রাজা' নামে কলম ব্যবহার করেছিলাম। তাতে ভাল লেখার চেয়ে বুক পকেটে ভাল কালি লাগত।

একহাতে বস্তনিতে বই আর অন্য হাতে দোয়াতের শিকে ঝুলিয়ে রোজ ইস্কুলে যাই এগারোটায়। ফিরি তিনটে সাড়ে তিনটেয়। প্রথম মান মানে ক্লাস ওআন। ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র আমিই ফর্সা জামাকাপড় পরা। অন্যরা নোংরাস্য নোংরা জামাকাপড়ে আসে।

অনেকেই খালি গা। মাস্টারমশাই তিনজন। বড় মাস্টারমশাই পড়ান তৃতীয় মান বা ক্লাস থ্রি। আমি প্রথম যাঁর ক্লাস করলাম তিনি সম্পর্কে আমার মেজ পিসেমশাই—ওই গাঁয়েরই লোক। বাংলা বানান শ্রুতলিপি ইত্যাদি আমি সহজে পারি, কেবল অঙ্কে হোঁচট খাই। ইংরেজি পড়ার বালাই নেই ইস্কুলে বা বাড়িতে।

পাঠশালার জীবন নীরস শুষ্ক। মাঝে মাঝে আলোড়ন জাগে যদি স্কুলের সাব ইন্সপেক্টার আসেন। আমরা বলতাম 'বাবু'। তাঁর আসার কথা আগে জানতে পারলে বড়মাস্টারমশাই বলতেন, 'ফর্সা জামা পরে এস, দাঁত মেজে এস।' 'বাবু' এসে খাতাপত্র দেখতেন, দু' চারটে প্রশ্ন করতেন এবং পরদিন ছুটি দিয়ে চলে যেতেন।

তারও চেয়ে বড় আলোড়ন হল ১৯৩৬ সালে। আমি তখন পাঠশালার শেষ ক্লাস তৃতীয় মানে পড়ি। কিছুদিন আগে হয়ে গেছে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বের রজতজয়ন্তী উৎসব। খুব লাড্ডু খেয়েছি সরকারী খরচে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বজ্রাঘাত! পঞ্চম জর্জ মারা গেলেন। আমাদের শোকসভা করতে হল। এবং এক পয়সা দিয়ে কিনতে হল এক চিলতে কালোকাপড়। সেইটে আমরা হাতে বেঁধে অশৌচ পালন করেছি এক মাস। রাজা হলেন অষ্টম এডোয়ার্ড। তাঁর ছবি টাঙাতে হল পাঠশালার দেয়ালে। কিছুদিন পরে তিনিও ছাড়লেন সিংহাসন। রাজা হলেন তোতলা ছোট ভাই ষষ্ঠ জর্জ। সেই ষষ্ঠ জর্জের মেয়ে এখনকার ইংলণ্ডেশ্বরী তখন এত্তো টুকুন মেয়ে—আমার থেকে বছর দুয়েকের বড়।

সেকালের পাঠশালায় জোর দেওয়া হত অঙ্কের উপর বেশি। কাঠাকালি বিঘাকালি ক্ষেত্রফল ইত্যাদি অঙ্ক করতে হত নিমেষে। তাছাড়া শিখতে হত জমা খরচের হিসাব, তমসুক কবালা ইত্যাদি লেখার কায়দা! অর্থাৎ একটি ছেলেকে এমন ভাবে তৈরি করা হত যে পরে দোকানদার বা গোমস্তা হতে তার বাধা থাকত না। অঙ্কের মধ্যে মানসাঙ্ক ছিল আরো ভয়াবহ। গণ্ডাকিয়া কড়াকিয়া ক্রান্তিকিয়াও এবং এগারোম্ এগারোম্ একুশ-একুশ, বারোম্ বারোম্ একশ' চুয়াল্লিশ

ইত্যাদি মুখস্থ করতে করতে গোটা বাল্যকালটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের মুখস্ত করতে হত খনার বচন শুভঙ্করের আর্যা। 'মণের দামের বানে ইলেকমাত্র দিলে, আধ পোয়ার দাম নিমেষেতে পেলে।' অর্থাৎ এক মণের দাম ১ টাকা হলে, আধ পো'র দাম এক পয়সা।

বাংলা কোর্সও পড়ার মত ছিল না। সরল নীতিসুধা জাতীয় বইয়ে কেবল উপদেশই থাকত। আমার কেবল মনে আছে 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বলে পাঠ্য বইয়ে লেখা থাকত। জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দাসের 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'পাখি সব করে রব' এবং সম্ভবত দীনবন্ধু মিত্রের 'রাত পোহাল ফর্সা হল' ইত্যাদি কবিতাগুলো মনে আছে। তবে বাবার কাছে আলাদা শেখা 'এ পারেতে বৃষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা, ওপারেতে মেঘের মাথায় একশ মানিক জ্বালা' কিংবা 'জলস্পর্শ করব না আর চিতোর রাণার পণ' ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে পাঠ্যবইয়ের কবিতাগুলো বড় পানসে মনে হ'ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই বয়সেই আমাকে নিয়ে যেত দূর স্বপ্নলোকে।

পাঠশালা থেকে ফেরার সময়ই পুকুরঘাটে হাত পা ধুয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকতে হত। ঢুকেই একথালা ভাত। সোনামুগের ডাল, নিরামিষ তরকারী মাছের ঝোল বা ঝাল। রাত্রেও তাই। তখন বড়রা খেতে বসলে আমরা ছোটরা ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াল তাড়ানোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতাম! বড়দের খাওয়া হলে পর আমি আর আমার মাসতুতো দাদা সমীর খেতে বসতাম। দাদামশাই বা মামার খাওয়ার সময় খুব কথা বলতেন, কিন্তু আমরা ছোটরা কথা বললেই অসভ্যতা হত।

বিকেলে ভাত খাওয়ার পর নিশ্ছিদ্র অবসর। বাতাবী নেবু দিয়ে ফুটবল খেলো, কিংবা ফুলগাছের খিদমদগারি কর কিংবা দিদিমার মাথার পাকা চুল বাছো। আমি মাঝে মাঝে একা পুকুর পাড়ে বসে

হিজিবিজি অনেক কিছু ভাবতাম।

সন্ধের ঠিক আগটায় খড়ম হাতে নিয়ে আবার পুকুরঘাটে। তারপর হাত পা মুখ ধুয়ে খটাস খটাস খড়ম পায়ে পড়ার ঘরে চলে আসা। লণ্ঠন জ্বালিয়ে মেঝেতে পাটি পেতে অন্তত এক ঘণ্টা পড়া চাই। কিন্তু সন্ধে যেতে না যেতেই অন্ধকার কালো থাবা বাড়িয়ে গাছপালা ঘেরা বাড়িটাকে গ্রাস করে। ঝিঁঝিপোকার আওয়াজ, বাঁশগাছের ক্যাঁচ ক্যাঁচ, হুতুম প্যাঁচার থমথমানি, পাতা ঝরার শব্দ—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক ভূতুড়ে পরিবেশ। পড়া মাথায় ওঠে। সাতটা বাজতে না বাজতেই এক থালায় ভাত বেড়ে দিদিমা আমাকে আর আমার মামাতো ভাই বোনদের 'কে খায়রে হাঁসের ডিম, কে খায়রে কবুতরের ডিম' বলে বলে খাইয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেন বিছানায়। গোটা ঘর অন্ধকার। গোটা বাড়ি অন্ধকার। কুপিবাতি জ্বলছে রান্নাঘরে। শোবার ঘরের লাগোয়া ভাঁড়ার ঘরে কিসের যেন শব্দ, উপরে টিনের চালে ধুপ করে কী যেন পড়ল, ইঁদুর ছুটে গেল খাটের তলা দিয়ে। ভয়ে আমার গা কাঁপতে থাকে। 'রাম-রাম' বলতে বলতে মনে জোর পাই। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। সব অন্ধকার সব শব্দ সব ভয় হারিয়ে যায় সুন্দর সুন্দর স্বপ্নে। কখন ভোর হয় টের পাই না। হঠাৎ শুনি ফুলের সাজি হাতে দাদামশাই হেঁড়ে গলায় গান গাইছেন—'মোহমায়া নিদ্রাঘোরে কত রবে অচেতন।' 'মোহমায়া' শব্দটি আমরা শুনতাম 'মহামায়া'। আমার দিদিমার নাম মহামায়া। আমরা মনে করতাম দাদামশাই বোধহয় দিদিমাকে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠার জন্যে বলছেন। দাদামশায়ের গানের সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি দিনের শুরু। আবার পুনরাবৃত্তির জন্য আমিও প্রস্তুত হই।

শ্রীগৌরী গ্রামটা যেমন বিরাট, তেমনি সমৃদ্ধ। ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি। কায়স্থ সাত আট ঘর। মুসলমানরাও আছেন। পাশে দেওরাইল ও মহাকলের জমিদার মুসলমান। পালপাড়ার সবাই ব্যবসায়ী। সবাই সম্পন্ন। সাহারাও তাই। যেমন ফিটফাট, তেমনি পয়সাওলা। গ্রামের মাঝখান দিয়ে গেছে রেলের লাইন। তখন

ছিল এ বি আর—আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। লোক্যাল বোর্ডের সিলেট শিলচর মোটর রাস্তা এবং বরাক নদীও গাঁয়ের ভিতর দিয়ে গেছে। ' মাল নিয়ে নদীতে স্টিমার যায় কলকাতা। কাছাড়-সুন্দরবন সার্ভিস। গ্রামের ভিতরে বিরাট বাজার, হাইস্কুল, ডাকঘর। গ্রামের বেশির ভাগ লোকেরই আয় চাষবাসে। চাকরি করেও অনেকে ছু'মাইল দূর বদরপুরে। আরো দূরে ডিগবয়ের তেলগাতাতেও কাজ করে কেউ কেউ। তেলগাতা মানে অয়েল ফিল্ড।

শ্রীগৌরী এখন কাছাড় জেলার ভেতরে। দেশ বিভাগের আগে ছিল সিলেট জেলায়। গ্রামের আশেপাশের এলাকা জুড়ে দাদামশায়ের নামডাক। আসাম বেঙ্গল রেলে ধর্মঘটের সময় বদরপুর জংশনের সব ধর্মঘটীদের বাড়িতে এনে তিনি রেখেছিলেন। সেই জন্যে রেলকর্মীদের কাছে তাঁর খুব খাতির। আমরা শুনতাম, দাদামশাই হাত দেখালেই রেল গাড়ি যখন খুশি যেখানে খুশি থামে। দাদামশাই খুব গল্পও দিতে পারতেন। রূপসীবাড়ি রেল স্টেশনে কিংবা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে এমন সব গাঁজাখুরি গল্প ছাড়তেন যে, আমরা হাঁ করে শুনতাম। প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত ছিল না। দাদামশায়ের বেশির ভাগ গল্প ছিল তাঁর ঘোড়া আর তার বাগানের কাঁঠাল নিয়ে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন শিলচর। বদরপুরের কাছে এসে হঠাৎ দেখেন চলতে চলতে পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে গেছে। মন খারাপ। কিন্তু শিলচর এসে যে-ই ঘোড়া থেকে নামলেন, দেখলেন ঘোড়ার পায়ের কাছে সেই মানিব্যাগ। অর্থাৎ কিনা এমনই বুদ্ধিমান তাঁর ঘোড়া যে, যখনই টের পেল বাবুর মানিব্যাগ মাটিতে পড়-পড়, তখনই সে ছোটার সঙ্গে লাথি মেরে মেরে আঠারো মাইল রাস্তা মানিব্যাগটা নিয়ে এসেছে। দাদামশায় ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে বললেন—শাবাস।

দাদামশায়ের এক একটি কাঠালের ভারে নৌকো ডুবে যেত, এক একটি ফুলকপির তলায় সাত সাতজন দাঁড়াতে পারত, বৃষ্টি এলেও কেউ ভিজত না, ফুলকপি ছাতার কাজ করত। সামনে বসে সবাই শুনতাম, আড়ালে বলতাম গুলিয়াস সীজার।

দাদা মশায়ের এক বন্ধু ছিলেন নিকুঞ্জ চক্রবর্তী। তিনি বাড়িতে এলে গল্পের ফোয়ারা বইত। দাদামশাই নিজের হাতে স্টোভে চা বানিয়ে তাঁকে খাওয়াতেন। নিকুঞ্জ চক্রবর্তী শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন, দাদামশাই বলতেন খাস সিলেটীতে। ওদের মধ্যে ছিল পাতানো মামা-ভাগনে সম্পর্ক। দাদামশাই তখন হয়ত আমাদের নিয়ে গোটা বাড়ি সাফাইয়ের কাজে লেগেছেন, এমন সময় সামনের সদর রাস্তায় নিকুঞ্জ ঠাকুরকে দেখে আমরা বাঁচলাম। নিকুঞ্জ ঠাকুর দূর থেকে ডাক দিলেন—"মাতুল মহাশয়, বাড়িতে আছেন নাকি?" দাদামশাই কাজটাজ ফেলে জবাব দিলেন—"কে, ভাইগ্না নি? আও আও আও।" ব্যস আমাদের কাজ শেষ। মামা ভাগ্নেতে আড্ডা শুরু হয়। সেই আড্ডায় একমাত্র বক্তা দাদামশাই এবং একমাত্র শ্রোতা নিকুঞ্জ ঠাকুর। চায়ের সঙ্গে দাদামশাই হাণ্টলি পামার্সের বিস্কুট খেতেন। নিকুঞ্জ ঠাকুর ব্রাহ্মণ বলে খেতেন না।

আমাদের সবাই খাতির করত সনৎ চৌধুরীর নাতি বলে। আমরা বলতে আমি আর আমার দুই মাসতুতো ভাই—সমীরদা ও হরিপদ এবং ঠাকুরমামার দিকে মামাতো ভাইবোন ইলা কান্তি তুষার প্রীতি। পরে মলয় ও মিনতি। ওই দুই মাসতুতো ভাইও মামাবাড়িতে পড়ুয়া। সমীরদা ও হরিপদ কয়েক বছর করে পড়াশোনার জন্যে ছিলেন। সোনামামা তখনও বিয়ে করেন নি। সোনামামা সব সময় ছিমছাম, সব কাজে পটু, কিন্তু চাকরি বাকরিতে মন বসে না। ঠাকুরমামারও তাই।

পাখি ঠাকুর ভাল কীর্তন গাইতেন। বাড়িতে হরির লুঠ দিতে হলে ডাক পড়ত পাখি ঠাকুরের। তাঁর ভাল নাম কী আমি এখনও জানি না। হেম চক্রবর্তী করতেন ডাক্তারী, কিন্তু আড্ডাই দিতেন বেশি। রোগী দেখতে কারো বাড়ি এলে পাকা দু'ঘণ্টা গল্প করতেন। শ্রীশ চক্রবর্তী, শশী চক্রবর্তীরা থাকতেন পেছনের দিকে একই বাড়িতে। ওদের বাড়ি থেকে রথ বেরোতো। রায় সাহেব উমেশ দত্ত ছিলেন আমার সম্পর্কে মামা। তিনি ছিলেন হাই স্কুলের হেড মাস্টার। পরে

হেড মাস্টার হন তাঁরই ছেলে সুবোধদা। পাঠশালা যাওয়ার পথে পড়ত মুন্সেফের বাড়ি। তাঁর ছেলে রমনবাবু ছিলেন মাতব্বর ব্যক্তি। আসা যাওয়ার পথে দেখতাম, তাঁকে ঘিরে আড্ডা বসেছে। ওই বাড়িরই ছেলে শশীবাবু। ওই এক ঘর ব্রাহ্ম গ্রামে ছিলেন একঘরে হয়ে। শশীবাবুর বাড়িতে আমরা অন্য খাবার দূরে থাক জলটলও খেতাম না। মানা ছিল। ওদের বাড়ির সবাই কথা বলতেন কলকাতার ভাষায়। আমরা হাঁ করে শুনতাম—কী মিষ্টি, কী সুন্দর। দিদিমা বলতেন—'দেশী কুত্তার মুখে বিলাতী আওয়াজ।'

পোস্ট অফিস আর রেল স্টেশন ছিল আমাদের প্রিয় জায়গা। ডাকঘরে নলিনী চক্রবর্তী মশাই সকাল বেলা এক ঘণ্টা বসতেন ঝাঁপ খুলে। তখন কুইনিনও বিক্রি হত ডাকঘরে ডাকঘরে। বাইরে একটা ছবিতে থাকত একজন পিলে-ওলা রোগা লোককে এক বড়ি কুইনিন দিচ্ছেন মহাদেব। আমার চিঠি আসত কদাচিৎ, কিন্তু অন্যের চিঠি দেখেও আনন্দ পেতাম। মন চলে যেত দূর দূর দেশে, সিলেটে ঢাকায় কলকাতায়। আর যেদিন মা বাবা বা ঠাকুরদার চিঠি আসত, বুকে জড়িয়ে ধরতাম। ঠাকুরদা ও বাবা চিঠিতে আমাকে সম্বোধন করতেন 'প্রাণাধিকেষু'।

রেল স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ানোও ছিল আমার অভ্যেস। কে আসে কে যায় দেখতেই আনন্দ। রূপসীবাড়ি ফ্ল্যাগ স্টেশন, ডাকগাড়ি থামে না। সুরমা মেল ভোরবেলা কলকাতা থেকে শিলচর যেত। সন্ধেবেলা যেত কলকাতার দিকে। রেল লাইনের পাশে বেড়ার তারে শরীর হেলিয়ে দিয়ে দেখতাম সুরমা মেল হরিণবেগে ছুটে যাচ্ছে। তার হুইসিলের শব্দ আলাদা, তার কামরার ধরন আলাদা। সে রেলে যেন কলকাতার সুবাস। মনে মনে ভাবতাম, কবে এই ট্রেন চড়ে আমি কলকাতায় যাব?

হাই স্কুলে ভর্তি হলাম ক্লাস ফোরে। ১৯৩৭ সালে। পাঠশালা ছেড়ে অন্য জগৎ। কিন্তু মোটামুটি একই রুটিন। পাঠশালার বন্ধুরা দু' চার জনও ভর্তি হল হাইস্কুলে। অন্যদের ওখানেই পড়া খতম।

রতীশ পুতুল মনজিৎ অরুণ বিপুলেশ সুনীল রাধারমণ সীতেশ বিনয় নরেশ সালাম আনোয়ার করিম হৃষীকেশ রসময় একে একে হল বন্ধু। তবে সবচেয়ে বড় বন্ধু হল রাখাল—বিপুলেশ নাগ। সে আসত বদরপুর ঘাট থেকে র‍্যালী সাইকেল চড়ে। একেবারে অন্য রকম ছেলে। সে আমাকে বলত শার্লি টেম্পলের গল্প, অবনীন্দ্রনাথের গল্প নিউটনের গল্প। প্রমথেনা বড়ুয়া এবং ফ্রেডি বার্থোলেমিউয়ের ঠিকানা ও জোগাড় করে আনে। টি এস ইলিয়ট মাওসে তুং মায়াকোৎস্তির ছবি এনে দেখায়। সে-ই আমাকে পথের পাঁচালি পড়ায়, কলকাতার স্বপ্ন দেখায়। রাখাল আমার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। তার কাছে আমার ঋণের সীমা পরিসীমা নেই।

বরাক নদীর গায়ে আমাদের হাই স্কুল। নদী আর স্কুলের মাঝখানে লোক্যাল বোর্ডের সড়ক। নদীর গায়ে ফুটবল খেলার মাঠ আর স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে টেনিস লন। ছাত্র শিক্ষক সবাই খেলতেন টেনিস। আমাদের স্কুল লন টেনিসে পরপর তিনবার সুরমা ভ্যালি চ্যাম্পিয়ান। তাছাড়া খেলা বলতে আমরা বুঝতাম দাইড়্যা বান্দা বা ধাপসা এবং হাডুডুডু। স্কুলের বাইরে ফুটবলের জায়গা নিত বাতাবী নেবু। আমার বড়কাকা-বাবু তিন নম্বরী একটা চামড়ার ফুটবল দিয়েছিলেন কিনে। গাঁয়ে আমার খাতির বেড়ে গেল। ফুটবলে যে লম্বা লম্বা শট মারতে পারত আর ভাল 'ক্যারি' করতে পারত, তাকেই বলা হত ভাল খেলোয়াড়। ক্রিকেট খেলার মারপ্যাঁচ ভাল বুঝতাম না, তাই হেড মাস্টার মশায়ের আনা গ্লাভস প্যাড ব্যাট বল উইকেট স্কুলের গুদাম ঘরে গড়াগড়ি খেয়েছে। শুধু ক্রিকেটের বলটা দিয়ে বাঁকানো গোড়াসমেত কচি বাঁশের হকিস্টিক বানিয়ে হকি খেলেছি। ওই হকি খেলার দৌলতেই একদিন দেখা গেল দাদামশায়ের বাড়ির পেছনের বাঁশঝাড় সাফ। ব্যাডমিণ্টনও খেলতাম স্কুলে। কিন্তু নদীর পারের হাওয়ায় শাটল কক এমন এলোমেলো ঘুরে বেড়াতো যে, কোন দিনই খেলা জমত না।

এখন বুঝতে পারি স্কুলে পড়াশোনার মান ছিল খুব নিচু। একমাত্র হেডমাস্টার সুবোধ দত্ত মশাই আর পণ্ডিতমশাই ছাড়া কেউই ছিলেন

না আধুনিক চিন্তার মানুষ। আর কী ইংরেজি কী বাংলা, উচ্চারণ ছিল সাংঘাতিক! অনেস্ট-কে হনেস্ট, কিংবা কনশেন্স-কে কনসাইন্স বলতে প্রায়ই শোনা যেত। উচ্চারণ ব্যাপারটা যে কত উচ্চমার্গের ছিল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলা আবৃত্তি করতে ডাক পড়ত আমার। নাম করা কেউ এলে আমাকে মুখস্ত বলতে হত রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস।' ডি পি আই সতীশ রায় মশাই আসার সঙ্গে সঙ্গে আমিও 'দেবতার গ্রাস' কণ্ঠে নিয়ে প্রস্তুত। তার জন্যে আমি মেডেলও পেয়েছি। বুঝুন তাহলে!

সাহিত্য চর্চা ব্যাপারটা আদৌ আমল পেত না। কেউ কবিতা লেখার চেষ্টা করলে 'কবি-কবি' বলে অন্যরা খেপাত। তবু তারই মধ্যে আমরা কয়েকজন হাতেলেখা একটা সাহিত্য পত্রিকা বের করেছিলাম। আমি দু'একটা কবিতাও লিখেছিলাম। খুব বাজে। তখন আমি আনন্দ মেলার সভ্য হয়েছি। একটা প্রশ্নের উত্তর ছাপা হয়েছে। আমি স্কুলে থাকতেই 'আমাদের আসাম' নামে সরকারী একটা কাগজে লিখে টাকা পাই। এবং কবিতাটি অসমীয়া ও ইংরাজিতে অনুবাদ হয়। তবে বদরপুর রেল কলোনি থেকে যারা পড়তে আসত, তাদের এসব ব্যাপারে উৎসাহ ছিল বেশি।

আমাদের ইউনিফর্ম বলে কিছু ছিল না। যে যা' পারে তা'ই পরে স্কুলে আসত। একেবারে ফ্যান্সি ড্রেস। কারো পায়ে জুতো ছিল না। প্রায় সকলেরই হাতে বা কাঁধে ছাতা থাকত। বৃষ্টির দেশ তো। সাইকেল চড়ে যারা আসত, তাদের ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাতাম। মুসলমান ছাত্ররা পরত লুঙ্গি আর শার্ট। কদাচিৎ পাজামা। হিন্দুরা ধুতি। নিচু ক্লাসে হাফ প্যান্ট। হিন্দুরা পাজামা পরত না। আমাদের স্কুলে বাইরে থেকে কেউ বক্তৃতা দিতে এলে আমি চঞ্চল হয়ে উঠতাম। নতুন দেশের কথা শুনতে দারুন ভাল লাগত। প্রধানত আসতেন পর্যটকরা। আমরা দু'আনা চার আনা চাঁদা তুলে পর্যটকদের রাহাখরচ দিতাম। জওহরলাল নেহরু আর সুভাষচন্দ্র বসুকেও স্কুলের সামনে প্রথম দেখি। আলাদা সময়ে ওঁরা সিলেট শহর থেকে শিলচর যাচ্ছিলেন। তখন

দুজনেই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। সুভাষবাবু গাড়ি থেকে নামেন নি, গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। নেহরু গাড়ি থেকে নেমে ছটফট ঘুরে বেড়ান, এদিক ওদিক তাকান। এক শ্রীগৌরী গ্রামেই ৪০টা ফটক বানানো হয়েছিল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। মেয়েদের উলুধ্বনি আর ধানদূর্বা দিয়ে বরণে নেহরু মুগ্ধ হয়ে যান। এসব কথা তিনি লিখেছেন তাঁর 'ইউনিটি অব ইণ্ডিয়া' বইয়ে।

আমাদের স্কুলে সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল সরস্বতী পুজো। ক্লাস নাইনের ছেলেদের উপর ভার থাকত পুজো পরিচালনার। স্কুলের বাইরে ধানখেতে হ'ত পুজো। খাগের কলম দুধের দোয়াতের সঙ্গে কিছু বই রাখতে হত প্রতিমার পদতলে। আমি সব সময় গণিতের বইই রাখতাম। সরস্বতী পুজোর চিঠি ছাপানো নিয়ে খুব হৈ চৈ হত। অন্য স্কুল থেকে যে সব নিমন্ত্রণ পত্র আসত সব টাঙিয়ে রাখা হত এক জায়গায়। কোন চিঠি কলাপাতায় ছাপা, কোন চিঠি ছাপা গাছের বাকলে। আমাদেব উপর যে বছর পুজোর ভার, তখন ঘোর যুদ্ধ চলছে। কাগজের টানাটানি। তবু তারই মধ্যে আমাদের পণ্ডিত মশাই বাণীপদ কাব্যতীর্থ যুদ্ধকালীন অনটনের উপর সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন। তার প্রথম পঙক্তি আমার এখনও মনে আছে—'হাহা শব্দং জগতি চলিতং বস্ত্র তৈলান্ন হীনাৎ—।'

সরস্বতী পুজোয় আমরা নাটক করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তেমন জমত না। একবার কর্ণার্জুন নামে একটি যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু কর্ণ আর অর্জুন দুটো পার্টই আমার ভাল লাগায় নাটকটা নতুন ভাবে সাজিয়ে আমি ওই দুইজনের ভূমিকাতেই অভিনয় করেছিলাম। ভাগ্যিস দর্শকের সংখ্যা নামমাত্র ছিল, এবং যারা ছিলেন তারা প্রায় সবাই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাই তীক্ষ্ণ সমালোচনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি।

সরস্বতী পুজো যেমন হিন্দুদের, মুসলমানদের তেমনি ছিল মিলাদ শরিফ। আমরা হালুয়া মতন কী একটা খেতাম। স্কুলের গায়েই একটা মসজিদ ছিল। সেখানেই অনুষ্ঠানটা হত। 'বাগদেবী কি জয়' বলে আমরা যখন সরস্বতী মূর্তি নিয়ে মিছিল বের করতাম, তখন

মসজিদের সামনে এসে বাজনা ও চিৎকার বন্ধ করে দিতাম। পাছে মারামারি হয়।

সংস্কৃত পণ্ডিতমশায়ের মত প্রত্যেক স্কুলে থাকতেন একজন মৌলবী সাহেব। তিনি আরবী ফারসি পড়াতেন। ক্লাস সেভেনে উঠে হিন্দুরা নিত সংস্কৃত, মুসলমানরা আরবী কিংবা ফারসি। রোজার মাসে আমাদের ক্লাস পিরিয়ডের সময় অর্ধেক করে দেওয়া হত। আমাদের তখন মনে হত, কেন মুসলমানরা সারা বছর রোজা করে না। তবে সে সময় একটা জিনিস বিচ্ছিরি লাগত। রোজাকরনেওয়ালা মুসলমান ছাত্ররা যেখানে সেখানে কেবল থুথু ফেলত। আমাদের সময় গরমের ছুটি ছিল একমাস, আর পুজার ছুটি তিন সপ্তাহ। বড়দিনের ছুটি দিন সাত। তাছাড়া ১১ ডিসেম্বর হত 'দরবার ডে'। সেদিনই দিল্লিতে পঞ্চম জর্জ নামক ইংলণ্ডেশ্বরের দরবার বসেছিল। সেই দরবার দিবসে হত স্কুলের স্পোর্টস। কাছাকাছি কোন কিশোরী দর্শক না থাকায় স্পোর্টস হত মিনমিনে।

গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটির সময় আমি মা-বাবার কাছে বড়থল চলে যেতাম। খুব ছোটবেলায় কেউ এসে নিয়ে যেত। কখনও বড়দা, কখনও নরেশদা। একটু বড় হতেই একা একা যাওয়া আসা করতাম। রূপসীবাড়ি থেকে ট্রেনে শিলচর। শিলচর স্টেশন থেকে স্যুটকেশ-হাতে মাইলখানেক হেঁটে নাজিরপট্টিতে পিসতুতো দিদির বাড়ি কিংবা জেল রোডে মা'র পিসিমার বাড়ি। সেখানে এক রাত থেকে বাসে চড়ে পয়লাপুল। তারপর চার মাইল পায়ে হেঁটে বা ট্রলিতে চড়ে বড়থল চা বাগান—যেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে গান বাজনা সাহিত্য আলোচনা আড্ডা। সেই সঙ্গে থাকে চাপা অভিমানও। মুখচোরা আমি ভাবতাম মা কেন আমাকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠালেন, বাবা কেন কদাচিৎ আমার খোঁজ নেন?

আসাযাওয়ার পথে কখনও কখনও শিলচরে থাকতাম এক রাত্রি। তখনকার শিলচর কত ছোট। কত ঘরোয়া। রিকশা বা সাইকেল-রিকশা আসে নি। মোটর গাড়ি একটি দুটি। বেশির ভাগ ঘোড়ার

গাড়ি। ঘোড়ার গাড়ির পিঠে ব্যাণ্ডপার্টি বসিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে সিনেমার হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হত। হ্যাণ্ডবিল পেতে আমরা গাড়ির পিছন পিছন ছুটতাম। আমার প্রথম দেখা বাংলা সিনেমা কণ্ঠহার, ইংরেজি এলিফ্যাণ্ট বয়। তখন আর ডি আই হলে ছিল ওরিয়েণ্টাল টকীজ। আর ছিল কলাবতী। শিলচরে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল এক পয়সার হজমী আর হাওয়া মিঠাই। আমার সমবয়সী টগোদা আর আমি হজমী মুখে ফেলে শহর ঘুরতাম। হাওয়া মিঠাইকে অনেকে বলত বুড়ির মাথার পাকা চুল।

শিলচরের রাজা তখন অরুণকুমার চন্দ। ভারত বিখ্যাত চন্দবাড়ির দিকে আমরা দূর থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকালাম। কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার চন্দের চার ছেলে—অপূর্ব অরুণ অশোক অনিল—স্ব স্ব ক্ষেত্রে সবাই খ্যাতিমান। পাশের বাড়ি হেমচন্দ্র দত্তের। বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ এই তুই বাড়ি থেকে যত উজ্জ্বল রত্ন বেরিয়েছে, ভারতের কোন বাড়ি থেকে এত বেরিয়েছে কি না সন্দেহ। তবে কাছাড়ের লোকদের কাছে পূজ্য ছিলেন কংগ্রেস নেতা অরুণ কুমার চন্দ। আমার পিসতুতো দাদা মহীতোষ পুরকায়স্থ—পরে আসামের বহুবিতর্কিত মন্ত্রী—ছিলেন তাঁর শিষ্য। অরুণ চন্দ মশাইকে আমি প্রথম কাছে থেকে দেখেছি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময়। তাঁর বিপুল দেহ আমাদের বিস্ময়ের কারণ ছিল। তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না চন্দও রাজনীতিতে নামেন পরে।

শিলচরে বাইরে থেকে আসত নানা রকম আকর্ষণ। আশীফুট উঁচু মঞ্চ থেকে গায়ে পেট্রোল লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে নিচে কুয়োতে ঝাঁপ দিতেন এক ভদ্রলোক। নাম পি. সি. পাল। তলা থেকে একজন বলতেন— 'পি সি পাল, আর ইউ রেডী?' উনি তখন 'রেডী' বলেই দেশলাই কাঠিতে গায়ে ফস করে আগুন ধরিয়ে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস ঝাঁপ দিতেন। বিপদ কাটলে পরে লোকে দিত হাততালি। চল্লিশের দশকের গোড়ায় মোহনবাগান যখন খেলতে এল, কী হৈ চৈ সারা জেলা জুড়ে। টিনের বেড়ায় খোলা মাঠ ঘিরে টিকিট কেটে

খেলার ব্যবস্থা। বিপক্ষে স্থানীয় বিখ্যাত ইণ্ডিয়া ক্লাব।

তবে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিল ১৯৪০ সালে উদয়শঙ্করের আগমন। এমন উত্তেজনা, এমন উদ্দীপনা আর কাউকে নিয়ে হয় নি। তাঁকে আনিয়েছিলেন বরদা দাস মশাই। উদয়শঙ্করের দলে ছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ বিষ্ণুদাস শিরালি, সিমকি জোহরা উজরা রবিশঙ্কর দেবেন্দ্রশঙ্কর খগেন দে নগেন দে প্রমুখ। রবিশঙ্কর তখন রবীন্দ্রশঙ্কর নামে নাচতেন। দু' ভাই খগেন দে—নগেন দে বাঁশি ও ম্যাণ্ডোলিন বাজাতেন। হরপার্বতী নৃত্যে উদয়শঙ্কর শিব, সিমকি পার্বতী। রাসলীলায় কৃষ্ণ উদয়শঙ্কর, রাধা সিমকি। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বাজালেন সরোদ।

আমি এই অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। এই একটি অনুষ্ঠান আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমি ভালোবাসতে শিখলাম শিল্পকে, ভালোবাসতে শিখলাম স্বদেশকে। আমার কানে অনবরত গুণগুণ করতে লাগল সুর, চোখের সামনে ভাসতে লাগল নাচের ছবি। চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন যেমন বলেছিলেন, তেমনি উদয়শঙ্করের অনিন্দ্য দেহকান্তি দেখে আমারও বলতে ইচ্ছে করেছিল—কাহারে হেরিলাম! আহা! সে কী সত্য, সে কী মায়া! সে কী কায়া! সে কী সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া! আমি তখনই স্থির করে ফেললাম, আমাকে ওই রকম একটা কিছু হতেই হবে। শিল্প জগৎ আমার জগৎ।

শ্রীগৌরীতে ফিরে এসেও আমার চোখের সামনে কেবল নাচ আর নাচ। সেই ছন্দ, সেই সুর, সেই রংই আমাকে অনেক পরে নিয়ে গিয়েছিল শান্তিনিকেতন। প্রবাসী পত্রিকা আর উদয়শঙ্করের অনুষ্ঠান—এই দুটিই প্রধান প্রেরণা। আর মা-বাবা ছাড়া ছিল, আগেই বলেছি, আমার বন্ধু রাখালের উৎসাহ। নইলে আমি এখন হয়ত ওই বাবা ঠাকুরদার চা বাগান বড়থলে এক সুখী গৃহস্থ।

যখন ফাইভ সিক্সে উঠে পড়েছি তখন মামাবাড়িতে অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। ঠাকুরমামা চা বাগানে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন বাইরে। সঙ্গে ঠাকুরমামী ও ভাইবোনেরা। সোনামামাও

ঘুরে বেড়ান বাইরে বাইরে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসেন আর পুকুরে মাছ ধরতে বসেন। আমরা কেঁচো, বোলতার ডিম আরশোলা ইত্যাদি জোগান দিই। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় মাস্টারদাও চলে গেছেন করিমগঞ্জে। তিনি হাই স্কুলে সায়েন্স পড়াতেন আর বাড়িতে আমাদের পড়া দেখতেন। থাকার মধ্যে তখন আমি, আমার মাসতুতো দাদা সমীর, দিদিমা ও দাদামশাই। কিন্তু হঠাৎ এক দিন দাদামশাইও চলে গেলেন মাইল দশ দূর তার পাঁচগ্রামের বাগান বাড়িতে। পরে টের পেলাম দাদামশায়ের গৃহত্যাগের পিছনে কারণ দিদিমার সঙ্গে মনান্তর। আমরা প্রায়ই দেখতাম, দুজনে খটাখটি লেগেই আছে। দাদামশাই যা বলেন, দিদিমা তার উলটো করেন এবং দিদিমা কিছু বললে দাদামশাই তিন ধমকে তাঁকে ঠাণ্ডা করেন। দু'জনের কথা কাটাকাটি শুরু হলেই আমরা দূর থেকে মজা দেখতাম।

দাদামশাই অবিশ্যি পুরোপুরি গৃহত্যাগ করেন নি। মাঝে মাঝে আসতেন। সকালে ভাটিয়াল গাড়িতে এসে বিকালের উজান গাড়িতে চলে যেতেন। দাদামশাই বাড়িতে এলে আমরা ভয়ে তটস্থ এবং মা দুর্গা বা মা কালীর কাছে মানত করতাম দাদামশাই যেন তাড়াতাড়ি পাঁচগ্রাম ফিরে যান। তিনি থাকলেই কাজ আর ধমক। গোলাপ বাগান সাফ করো, গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে আনো, চিঠি নিয়ে বদরপুর যাও ইত্যাদি ইত্যাদি। দাদামশাই চলে গেলেই আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই দিদিমার রাজত্বে।

দাদামশাই পাঁচগ্রামে টিলার উপর একটা সুন্দর ছোট্ট, বাড়িতে থাকতেন। স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেই রান্নাবান্না করতেন। অন্যের কাজ তাঁর পছন্দ হ'ত না। বড় ছিমছাম তাঁর ঘরদোর। আমি দু'একবার ওখানে গিয়ে থেকেছি। ভয় ছিল, অকারণে ধমক খাব। কিন্তু দেখলাম তা' নয়, দাদামশাই আদর করতেও জানেন।

দাদামশাই শ্রীগৌরীর বাড়িতে এলে পুবের ঘর অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘর খুলতেন। অন্য সময় বন্ধ থাকত। ওই ঘরে নানা রকম ঝাড় লণ্ঠন, বড় বড় পেইন্টিং ও আলমারি ভর্তি বই ছিল। আমার নজর

ছিল বইয়ের দিকে। বাড়িতে আছে অথচ পড়তে পারি না—কী কষ্ট! একবার আমি আর আমার মামাতো ভাই কান্তি (কান্তি অর্থাৎ মৃণালকান্তি দত্ত চৌধুরী, এখন নামকরা অর্থনীতিবিদ,) গোপনে ওই ঘরে ঢুকি এবং আলমারির তালা ভেঙে কিছু বই বাইরে নিয়ে আসি। পড়ে আবার জায়গায় রেখে দিই। এই ভাবে কিছুদিন চলার পর আমাদের সাহস বেড়ে যায়। যত বই আলমারি থেকে আনি, তত বই ফেরৎ রাখি না।

কান্তি আমার সাক্ষাৎ—শিষ্য। আমি যা বলি তার কাছে বেদবাক্য। আমরা দু'জনে মিলে ছবি জমাতাম। সেই ছবি জমিয়ে এলবাম তৈরি করি। আমার এলবামের নাম বাবা দিয়ে দেন চিত্রচয়নিকা। এখনও আছে আমার কাছে। সাহিত্য শিল্প সংগীত সিনেমা থিয়েটার ধর্ম খেলা রাজনীতি—সব বিষয়ে দেশী বিদেশী খ্যাতিমানদের ছবি। তার মধ্যে অনেকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। বড় মূল্যবান এলবাম। কান্তিও আমার দেখাদেখি এলবাম তৈরি করেছিল, সেটি হারিয়ে গেছে। আমরা দু'জনে রাত্রে বিছানায় শুয়ে জেনারেল নলেজের খেলা ও খেলতাম।

আমি যখন ছবি আঁকতে শুরু করি, কান্তিও তা'ই করে। আমি যে বিষয়ে কবিতা লিখি, সেও ওই বিষয়ে কলম ধরে। বলা নিষ্প্রয়োজন দু'জনের রচনাই সমান নিকৃষ্ট। তবে ছবির ব্যাপারে আমাদের একটা আদালত ছিল। পিছনের বাড়িতে থাকতেন রাঙাদা—আমার মেজ-পিসিমার ছেলে। তিনি ভালো ছবি আঁকতেন। বিশেষ করে বাঁদর আঁকাতে তিনি ছিলেন এক্সপার্ট। তাঁর বাড়ি ভর্তি ছিল চকখড়িতে আঁকা অসংখ্য বাঁদর। রাঙাদার কাছে ছবিগুলো নিয়ে যেতেই তিনি আমার দু' একটি পাশ করিয়ে দিতেন, কিন্তু কান্তির আঁকা সব ক'টি 'বাজে' বলে ঠেলে ফেলে দিতেন। বেচারা কান্তি মনমরা হয়ে আসত এবং পরে রাঙাদাকে খুশি করার জন্যে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার ছবি আঁকতে লাগত।

বলছিলাম বইয়ের কথা। কান্তি তখন ঠাকুরমামা ঠাকুরমামীদের

ছেড়ে শ্রীগৌরীতে এসেছে স্কুলে পড়ার জন্যে। আগেই বলেছি তখন থেকে সে আমার সাকরেদ। কান্তিই পরামর্শ দিল দাদামশাইয়ের বইগুলো দিয়ে আলাদা একটা লাইব্রেরি করলে কেমন হয়। যেমন কথা তেমন কাজ। আমি তখন আনন্দ মেলার সভ্য (নম্বর ১০৮৫০)। মৌমাছিকে চিঠি লিখে তৈরি করলাম শ্রীগৌরী মণিমেলা। আমিই মধ্যমণি। ওই মণিমেলার নাম দিয়েই আমরা দু'জনে আলাদা একটা লাইব্রেরি বানালাম। সমবয়সীদের কাছে আমাদের খাতির দারুন বেড়ে গেল। লাউয়ের গলা কেটে তাতে উলটো অক্ষর কেটে শীল-মোহর তৈরি হল 'শ্রীগৌরী মণিমেলা গ্রন্থাগার'। শীলমোহরের ছাপ পড়ল দাদামশায়ের আলমারির সব বইয়ে। তার মধ্যে অত্যুৎসাহে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ছিঁড়ে আলাদা আলাদা করে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা রাজসিংহ বই করলাম। আমাদের উৎসাহ তখন প্রবল। পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে, লাইব্রেরির বই দেওয়া নেওয়া নিয়েই ব্যস্ত। আমি মধ্যমণি হিসেবে হেড লাইব্রেরিয়ান এবং সাকরেদ হিসেবে কান্তি এসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ান।

কিন্তু ইতিমধ্যে বজ্রাঘাত। হঠাৎ একদিন দাদামশায়ের নজর গেল বইয়ের আলমারি খালি। সঙ্গত কারণেই দুই নাতিকে চোর হিসাবে তিনি সন্দেহ করলেন। চোরের প্রাপ্য যে শাস্তি, তা দিতেও তিনি প্রস্তুত হলেন। তাঁর রায়ত একজনকে পাঠালেন থানায় আমাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে। তার আগে চড় চাপড় ধমক ইত্যাদি চলছে। আমরা ঠকঠক কাঁপছি। সত্যিই তো, চুরি নামক মহাপাপের শাস্তি আমাদের মাথা পেতে নিতেই হবে। কিন্তু পড়াশোনা তো গেলই, মা বাবা জানলে তো আরো বকবেন। তা ছাড়া জেলে গেলে তো শুনি খুব কষ্ট। থাকব কী করে?

ওদিকে দাদামশাই তখন চোর ধরার আনন্দে দাবিয়ে বেড়াচ্ছেন আর আমাকে উদ্দেশ্য করে অনবরত বলে চলেছেন, "কই গেলে হে মধ্যমণি, আজ তোমার জন্য আছে উত্তম মধ্যম মণি।" তাঁর হাঁকডাকে আমি আঁৎকে উঠি।

এমন সময় মঞ্চে এলেন দিদিমা। বাইরের উঠোনে তখন বেশ ভিড়। সবাই এসেছে মজা দেখতে। সনৎ চৌধুরীর হাতে তাঁর দুই নাতি কেমন নাকাল হয়, না দেখলে কী চলে। ভাগ্যিস ওই ভিড়ে ক্লাসমেট কেউ নেই। দিদিমা ঘোমটায় মুখ আড়াল করে দাদামশাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "নিজে তো সম্পত্তি উড়িয়েছেন দু'হাতে, আর আর দুই নাতি যদি কিছু বই নষ্ট করেই থাকে, তাতে দোষের কিছু নেই।" বলেই দিদিমা আমার ও কান্তির হাত ধরে আমাদের ভিতর বাড়িতে নিয়ে এলেন। দাদামশাই থ। তাঁর সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন বৃথাই গেল। একজন পৌত্র ও একজন দৌহিত্রকে শাস্তি দেওয়ার মহৎ কর্তব্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত করার দায়ে তিনি দিদিমার গমন পথের দিকে কটমট করে তাকালেন, কিন্তু আর কিছু করা বা বলা মানেই নতুন অশান্তি—এই কথা বিবেচনা করে দাদামশাই রণে ভঙ্গ দিলেন এবং কাঁধে এণ্ডির চাদর ফেলে এবং মুখে চুরুট গুঁজে ছড়ি হাতে গটমট রূপসীবাড়ি রেল স্টেশনের দিকে চলে গেলেন। আমরা অনুমান করে নিলাম, আগামী মাসখানেক তিনি এ মুখো হচ্ছেন না। দাদামশাই এমনিতে স্নেহশীল কিন্তু রাগের সময় চণ্ডাল। আমার মাসতুতো দাদা সমীরকে তো বাড়ি থেকে বের করেই দেন তুচ্ছ এক অপরাধে। তার জন্যে তাঁকে আপশোস করতেও শুনিনি কোন দিন।

দিদিমা ছিলেন তার উলটো। অত হম্বিতম্বি তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর আদরের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্তই ছিল, কিন্তু এমন হিসেবী ছিলেন যে, এত থেকেও তাঁর কিছুই ছিল না। এই হিসেবিপনা থেকেই পাশের ঘরের শরিক দিদিমণি আর সুন্দরমামা সুন্দরমামীদের সঙ্গে লাগত বিবাদ। আমার খুব খারাপ লাগত। সংসারের সেই সব শরিকী কলহ, দাদামশাই দিদিমার মনান্তর, দুই মামার আপাত উদাসীনতা আমাকে ভীষণ পীড়া দিত। তবে বুঝে গিয়েছিলাম এই মনোবেদনা থেকে পরিত্রাণের পথ আপাতত আমার নেই। আমাকে থাকতেই হবে এখানে, ভগ্নদশাপ্রাপ্ত এই বিরাট বাড়িতে। দাদামশাই আলাদা সরে যাওয়ায় এবং দুই মামা বাইরে থাকায় একা দিদিমার পক্ষে সম্ভব ছিল

না সব দিক সামলানো। চোখের সামনেই দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে গোলাপবাগান শুকিয়ে যাচ্ছে, পুকুরে পানা জমছে, পালকিতে উই ধরছে, দু'দুটো ঘোড়া মারা গেছে, চারদিকে হতশ্রীর ছবি। এবং তারই মাঝখানে আছি আমি। আমার একমাত্র সম্বল কলকাতাতে গিয়ে কলেজে পড়ার স্বপ্ন। এই স্বপ্নই আমাকে আরো নিঃসঙ্গ করে দিল। এই গ্রাম এই বাড়ি কিছুই যেন আমার না। আমি এখানে অনাহূত বিদেশী। হাফপ্যান্ট ছেড়ে ধুতি ধরি, লুকিয়ে একদিন বিড়ি খেতে গিয়ে দিদিমার হাতে চড় খাই, গোঁফের রেখা দেখা যায় আমার ঠোঁটের উপরে, স্বর ভঙ্গে গলা হয় অন্য রকম—আমি বাল্য কাটিয়ে কৈশোরে প্রমোশন পাই, কিন্তু আমার নিঃসঙ্গতা কাটে না। সেই একই রোজ- রুটিন, স্কুলে যাওয়া আর আসা। শুধু সুরমা মেল যখন রূপসী বাড়ি দিয়ে যায় আমি তার সাহচর্য অনুভব করি, মনে মনে বলি তুমিই আমার স্বর্গে যাবার বাহন।

অবশ্য তারই মধ্যে থেকে যায় কিছু বৈচিত্র্য। সন্ধ্যার পর বাঁশ-ঝাড়ের তলা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরতাম এবং বাঁশের পাতার ফাঁকে জোনাকি যখন ভূতের চোখের মত জ্বলত, 'রাম রাম' বলতে বলতে এগোতাম, আর ছিল সাপের ভয়। গোখরো কেউটে দাঁড়াশে ভর্তি পথ ঘাট। ভাঁড়ারে মাটির হাঁড়িতে হাত দিতেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। —ও ম্মা সাপ! অনবরত তাই আমাদের বলতে হত 'দোহাই আস্তিক মুনি দোহাই আস্তিক মুনি।' সাপ যেমন নানা রকম, গাঁয়ের ভূতও তেমনি বহু প্রকার। বাড়ির বউদের ঘাড়ে ভূত চাপতো যখন তখন। তার জন্যে ওঝারা হাজির থাকত। নাকে লঙ্কার গুঁড়ো দিতেই বউ বেচারী যখন চেঁচাতো, ওঝা বলতে বলতো, 'ওরে হারামজাদী, ঘাড় থেকে নামবি কিনা বল্।' বলেই ঝাঁটাপেটা করত বউটিকে। 'গেলাম গেলাম মরে গেলাম' চিৎকার করে সে শুয়ে পড়তেই ওঝা বলত, 'শাকচুন্নিটা ভেগেছে।'

পেত্নিরা থাকত পেছনের পুকুরের আশে পাশে। ওরা কাঁচা মাছ ধরে ধরে খেত। ব্রহ্মদৈত্যরা আসতেন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়। শাদা

থান শাদা পৈতে এবং পায়ে খড়ম। বাড়ির বেলগাছে তাঁর অধিষ্ঠান বাইরের উঠোনে একটু শব্দ হলেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝতাম তিনি এসে গেছেন। ভয়ে শরীর কাঁপত।

একবার আমার ঠাকুরমামা এক ব্রহ্মদৈত্যকে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন। মাঝ রাত্তিরে ঠাকুরমামার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে এসে দেখেন ব্রহ্মদৈত্যের চেহারা নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবলেন একটা ভূত মেরে নাম করা যাক। একটা বিরাট লাঠি নিয়ে তিনি তাড়া করলেন ব্রহ্মদৈত্যকে। ব্রহ্মদৈত্যও দৌড় মেরে পুকুর পাড়ে হাজির। পেছনে ঠাকুরমামার লাঠি। বেচারা ব্রহ্মদৈত্য স্নানের ঘাট দিয়ে জলে নেমে পড়ল। ঠাকুরমামা তার পরেও যখন মাথায় লাঠি মারতে উদ্যত, ব্রহ্মদৈত্য কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—"মশাই আমি একজন ব্রাহ্মণ অতিথি। অন্য কোথাও স্থান না পেয়ে আশ্রয়ের আশায় এই অসময়ে আপনাদের বাড়িতে এসেছি। আমাকে মারবেন না"। 'আপনি তাহলে ব্রহ্মদৈত্য নন,'—এই কথা বলে ঠাকুরমামা লাঠি নামিয়ে ওই অতিথিকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এলেন। তখন অতিথিরা সময় অসময়ে প্রায়ই এসে থাকতেন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে।

দাদামশায়ের শাদা ঘোড়াটা মরার পর আমাদের কী দুশ্চিন্তা। ঘোড়া মরলে নাকি জিন হয়। জিন না হওয়ার জন্যে দিদিমা ঘোড়ার কবরে সামান্য একটু সোনা দিয়েছিলেন। কিন্তু হিসাবী দিদিমা যদি সোনার বদলে পেতল দিয়ে থাকেন, তাহলে তো কাজ হবে না এই দুশ্চিন্তায় আমরা সন্ধে হলেই আস্তাবলের পেছনে লটকান গাছের তলায় একটা জিন দেখতাম। আর চিঁহি চিঁহি ডাক শুনতাম।

ভূতের ব্যাপারে শাহানশাহ ছিলেন আমাদের রাঙাদা—যার কথা আগেই বলেছি। কুবুদ্ধিতে তিনি ছিলেন কীর্তিমান। তাঁর নিজের বাড়িতে তিনি এক নাগাড়ে ভূতের উপদ্রব চালিয়েছিলেন। সন্ধের পরই টিনের চালে অনবরত ঢিল পড়ে এবং পেছনের দরজা খোলার জন্যে ভূত টানাটানি করে। রাঙাদার বাবা এদিকে হুড়কো আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। দরজা খুললেই তো কেলেঙ্কারি। ভূত ঘরে ঢুকে পড়বে।

রাঙাদাদের বাড়িতে থাকতেন এক সাধুবাবা—যিনি নাকি ছিলেন স্বয়ং মহাদেব। একমাত্র আমার সোনামামা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করলেও গ্রামবাসীর কাছে তাঁর মহাদেবত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিনি প্রায়ই আমাদের কাছে ডেকে নিয়ে কৈলাসের জলবায়ুর বর্ণনা দিতেন। তাঁর গায়ে গেরুয়া বসন, হাতে চিমটে, মাথায় জটা। তিনি বলতেন জটার ভিতরে সাপ আছে। আমরা বিশ্বাস করতাম। আমার মেজ পিসিমার শ্বশুরবাড়িও শ্রীগৌরী গ্রামে। মেজপিসিমার ছেলে বেণুই আমার রাঙাদা। মেজপিসিমা সব রকম অলৌকিকত্বেই বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসের বশেই মহাদেবজ্ঞানে ওই সাধুবাবাকে বাড়িতে রাখেন। বাড়িতে রোজ যখন ভূতের উপদ্রব চলছে, সাধুবাবা স্মিতহাস্যে বলেন, "নন্দীভৃঙ্গীর কাণ্ড। আমাকে কৈলাসে নিয়ে যাবার জন্যে রোজ রাত্রে আসছে। কিন্তু এখন তো আমার এখান থেকে নড়ার উপায় নেই।" সাধুবাবার কথায় মেজপিসিমা পিসেমশাইয়ের ভূতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। টিনে ঢিল পড়তেই বাড়িতে আওয়াজ ওঠে "সাধুবাবা কি জয়," "বম ভোলানাথ বম্ বম্।"

খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই কিছু কিছু সাহসী লোক কাণ্ডটা দেখতে আসতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আমার বড়কাকা নাহারকাটিয়া থেকে এসে হাজির। তিনি এসেই সন্দেহ করলেন রাঙাদাকে। তার কান ধরে দুটো চড় মারতেই রাঙাদা স্বীকার করলেন নানা কায়দায় এতদিন তিনি এসব করে যাচ্ছেন। পরদিনেই ভূতের আবির্ভাব বন্ধ হয়ে গেল। সাধুবাবাও দেখলাম কার্যান্তরে গ্রামান্তরে চলে গেছেন। কিছু দিন পর আবার এলেন নতুন বার্তা নিয়ে। সম্ভবত কৈলাসে জরুরী তলব পড়েছিল বলেই সাধুবাবা এতদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন।

ভূতপ্রেতের উৎপাত ছাড়া গ্রামের জীবন ছিল নিস্তরঙ্গ। যারা 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' বলে গ্রামের ওকালতি করেন, আমি তাঁদের দলে নই। নীচতা, খলতা শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি। তার উপর গ্রাম্যতা নামক কুৎসিত বস্তুটি তো আছেই। তারও চেয়ে মারাত্মক, নৈতিক জীবনটাও ছিল খারাপ। অমুক বিধবার সঙ্গে তমুক ভটচার্জির

সম্পর্ক, অমুকের আত্মহত্যার এবং তমুক কুমারীর দীর্ঘ প্রবাসের কারণ বেশিদিন গোপন থাকত না। সবাই মোটামুটি সহজ মনেই মেনে নিত। বাইরে সাধু পণ্ডিত, ভিতরে বদমাস—এমন লোকের অভাবও গ্রামে ছিল না।

মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায়ই একই রকমের ছিল। সেই সম্পর্ক ঘৃণার। তবে মুসলমানেরা জানতো, কতটা তারা এগোতো পারে, আর আমাদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমরা কতটা এগোতে পারি। ছোটবেলা থেকেই জাত জাত বলে তোতাপাখির বুলি শেখানো হয়েছে। শ্রীগৌরী ব্রাহ্মণ-শাসিত গ্রাম, তাই জাত পাতের দাপটটা ছিল বেশি। তবে দেখতাম পাশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের কেউ এলে তাকে চাচা বা মামু বা দাদা বলে খুব খাতির করা হ'ত। তাদের জন্যে আলাদা হুঁকো এবং আলাদা চায়ের কাপ থাকলেও টের পেতাম, যেহেতু ধনী তাই মুসলমান হলেও আগ বাড়িয়ে সালাম জানালে হিন্দু সমাজে দোষ হয় না।

সবচেয়ে অসুবিধে হ'ত নেমন্তন্ন খাওয়ার সময়। আমার নেমন্তন্ন খেতে যেতে ভাল লাগত না, কিন্তু দিদিমা নাতিদের পাঠাবেনই। নেমন্তন্নের ঘটা অনেক। ধরা যাক কারো বাড়ি বিয়ে। প্রথমে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গলবস্ত্র অনুরোধ, দয়া করে আসবেন, ভোজন করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সে দিন সকালে আবার সরষের তেল হাতে বাড়ি বাড়ি এসে বলতে হবে, স্নান সেরে চলে আসুন, অন্ন প্রস্তুত। আমরা খেতে যেতাম বেলা দু'টো নাগাদ। গিয়ে দেখতাম তখনও ব্রাহ্মণভোজন চলছে। নগদ ভোজন-দক্ষিণা নিয়ে ব্রাহ্মণরা যখন বিদায় নিলেন, আর আমাদের মত শূদ্রদের ডাক পড়ল, তখন শামিয়ানা টাঙানো উঠোনে পেট্রোম্যাক্স জ্বালানো হয়েছে। রাতে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল না। সবই দুপুরে। কিন্তু আমাদের খেতে খেতে সন্ধে হয়ে যেত। বিয়ে বাড়িতে রওনা হবার সময় দিদিমা শিখিয়ে দিতেন, প্রথমে চার পাঁচ রকমের ডাল থাকবে, ওগুলো খেয়ে পেট যেন ভরিয়ে না ফেলি। পরে মাছ আছে মাংস আছে, পায়েস আছে। দিদিমার নির্দেশ মত

এক পেট খেয়ে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন দিদিমার রাতের রান্নারও দরকার পড়ত না।

আমাদের অঞ্চলে শ্রাদ্ধ বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কিছু ভাল রীতি এখনও অবশিষ্ট আছে। পণ দেওয়া নেওয়া নেই। অতি ঘনিষ্ঠ না হলে উপহার দেওয়ার রেওয়াজও নেই। নিমন্ত্রিতরা সবাই দু'টাকা চার টাকা দেন। তাতে অনেক টাকা জড় হয়, শ্রাদ্ধকর্তা বা বিবাহকর্তার বেশ কাজে লাগে। বারোটা ফুলদানি, সাতাশটা শরবতের সেটের চেয়ে ওই টাকা ঢের ভাল। বিয়ের সময় গান দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সাত আট দিন। সঙ্গে ধামাইল নাচ। শহুরে বাবুদের নকলে আমরা ওই মেয়েলী গান ও নাচ নাক সিঁটকে দেখতাম ও শুনতাম। এখন আবার পাত্তা দিচ্ছি, শহর পাত্তা দিয়েছে বলে।

অনুষ্ঠানদি ছাড়াও গান শোনা যেত যত্রতত্র যখন তখন। অষ্টপ্রহর বা উদয়াস্ত সংকীর্তন হলে সারা গাঁ গানে ডুবে থাকত। বাড়িতে গোপাল সেবা হলে মেয়েরা গানের রীলে রেস চালাতেন সারা দিন। তাছাড়া মাঠে গান, নদীতে গান, রাস্তায় গান। স্তব্ধ দুপুরে ঘুঘু পাখির ডাক থামিয়ে কোন রাখাল বালকের কণ্ঠে 'মইষ রাখো, মইষাল বন্ধুরে' শুনলে যেমন কান্না পেত, তেমনি মন উদাস হয়ে যেত দুপুর বেলায় আজান শুনলে। ওই দুপুরে কেউ বাঁশি বাজাত না। এক ছেলের মা খেতে বসে বাঁশি শুনলে থালায় জল ঢেলে উঠে পড়তেন। আর খেলে নাকি ছেলের অমঙ্গল! তারপর দেখা যেত অভুক্ত সেই মা লালপাড় শাড়িতে মুখ ঢেকে থালা হাতে চলেছেন পুকুরপাড়ে এবং ছাই আর তেঁতুল দিয়ে বাসন মাজতে মাজতে গান ধরেছেন, "তোরা যারে বলাই মাঠেতে, নীলমণিরে দিব না আজ গোষ্ঠেতে।" একটু গানের সুরে কিংবা আজানের মৃদু আওয়াজ মেশা ঘুঘুর ডাকে সেই সব দুপুর হঠাৎ অলৌকিক হয়ে যেত।

বাড়িতে বৈষ্ণবীদের আনাগোনা ছিল প্রচুর। কপালে রসকলি, হাতে করতাল, মুখে হরেকৃষ্ণ। আমরা তাঁদের কাছে 'গোপাল'। করতাল বাজিয়ে বৈষ্ণবীরা গান গাইতেন আর চাল ভিক্ষে করতেন। স্কুল থেকে আমরা যখন ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ফিরছি, তখন রোজ দেখতাম এক

চেনা বৈষ্ণবী মুখে হাসিটি ফুটিয়ে হাসনপুরের আখড়ার দিকে চলেছেন। মুখে গান। তিনি ধানের খেতের আল ধরে চলে গেলেও সারা মাঠে সারা পথে ছড়িয়ে থাকত সুর—"কৃষ্ণ বিনে প্রাণ বাঁচে না, ওগো ললিতে—।" কে এই ললিতে, কেনই বা কৃষ্ণ ছাড়া প্রাণ বাঁচছে না—সব ভাল বুঝতাম না, কিন্তু সেই সব গান শুনে শুনে গ্রামের সব কিশোরীদের রাধা বলে মনে হত এবং নিজেকে কৃষ্ণ ভাবতে ভাল লাগত।

মনসার গান ছিল আর একটা আকর্ষণ। প্রতি বছর বিষহরি বা মনসা পুজোর সময় কারো না কারো বাড়িতে মনসা মঙ্গল পালা গাওয়া হত। আমরা বলতাম পদ্মপুরাণ। পাঁচালিকারদের মধ্যে জন প্রিয় ছিলেন নারায়ণদেব এবং ষষ্ঠীবর দত্ত। যাত্রার আসরের মত চারদিক ঘিরে লোক বসত শামিয়ানার তলায়। আসরের মাঝখানে থাকতেন মূল গাইয়ে। তাঁকে কেন জানি না বলা হত 'গুর্মা। পরনে কত্থক নাচিয়ের পোশাক এবং দু'হাতে চামর। ওই চামর দুলিয়ে তিনি চার পাঁচ দিন ধরে মনসা মঙ্গল পালা গাইতেন। সঙ্গে থাকত দোহার ও ঢোল বাজিয়ে। গাইয়ে ঢোলের তালে তালে গানের সুরে সুরে নাচের ভঙ্গী করতেন। ঢুলীও নাচতেন। অদ্ভুত সে সব পদভঙ্গী। এই মনসা বা বিষহরি পুজো এবং গুর্মাকে দিয়ে গান গাওয়ানো চাঁদ বণিকের সগোত্র সাহাদের মধ্যে বেশি চালু ছিল।

বাইরে থেকে যাত্রাগান আসত কদাচিৎ। খুলনা থেকে প্রভাত অপেরা, হবিগঞ্জ থেকে ঘাটিয়া এবং নট্ট কোম্পানী ও ঘোষাল অপেরা ছিল জনপ্রিয়। শ্রীগৌরী বাজারে বা বদরপুর রেল কলোনিতে যাত্রা হলে দিদিমাকে লুকিয়ে চলে যেতাম। দিদিমা ঘুমোলেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে আমি ও সমীরদা যাত্রার আসরে পালাতাম। শেষ রাত্তিরে ফিরে এসে আবার যে-যার বিছানায়। দিদিমা টের পেতেন না।

নৌকো বাইচ নিয়েও গ্রাম সরগরম থাকত। দুটো গাঁয়ের মধ্যে চলত প্রতিযোগিতা। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে এক দলে বাইচ খেলত। বরাক নদীতে সে কী সাজ সাজ রব। চারদিকে কেবল "হৈ হৈ হৈয়া" আওয়াজ এবং গান—"ও রণের ঘোড়া দৌড়াইয়া যাও।" নৌকা দৌড়

শুরু হওয়ার আগে গানে গানে কথা কাটাকাটি হ'ত। এক পক্ষ হয়ত প্রতিপক্ষ গ্রামের কোন রসের ঘটনাকে নিয়ে গান ছাড়লেন ও রঙিন ভাসুর গো, তুমি কেনে দেওর হইলে না, তুমি যদি হৈতে দেওর, খাইতে বাটার পান, হাসি মুখে কইতে কথা জুড়াইত পরাণ।" অন্য দলের লোকেরা ব্যঙ্গটা ঠিক ধরতে পেরে তৎক্ষণাৎ তার জবাব দেয় গানে —"তুলসির তলে কুত্তায় মুত্লে তুলসির মান কি যায়, তাই বলিয়া মন্দ লোকে কুৎসা রটায়, সখিগো—।" এইভাবে অনেকক্ষণ ছড়া কাটাকাটির পর আসল দৌড়। যে দল জিতত, পেত অনেকগুলো নারকেল।

শ্রীগৌরী থেকে তিন মাইল দূর সিদ্ধেশ্বর শিববাড়িতে চৈত্র সংক্রান্তির সময় হত বারুণী মেলা। একটু বড় হয়ে মেলায় যেতাম আর দু'পয়সা দিয়ে কিনে খেতাম লাল রঙের সোডা ওয়াটার। তখন সোডার বোতল ছিল অন্য রকম।

আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল শীতের আগটায়। ধান কাটার উৎসব মাঠে মাঠে। বাড়ি ভরতি পাকা ধানের গন্ধ। গরু দিয়ে চলছে ধান মাড়াই, কিছু যাচ্ছে ভাঁড়ারে, কিছু বাজারে। খড়ের গাদা বাড়িময়। সেই খড়ের চুড়োয় উঠে দাপাদাপি তখন আমাদের একমাত্র বৈকালী খেলা। খেলা শেষে সারা গায়ে চুলকোনি।

তবে সে সময় আমি প্রতীক্ষা করে থাকতাম আর একটি জিনিসের জন্যে। ধান কাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুরো পৌষ মাস গ্রামের রাখাল ছেলেরা সন্ধের পর ছড়া কাটাতে আসত দল বেঁধে। একজন দলপতি, সঙ্গে সাত আট জন দোহার। প্রতি সন্ধ্যায় অনেকগুলো দল। দলপতি হঠাৎ অন্ধকারে হাজির হয়ে ভিতরের উঠোনে এক লাইন বলামাত্র সঙ্গীরা বলে—'হৈয়ে।' যেমন—

ও ভাই মাঝি—হৈয়ে
তোমার কাছে টাকাটি—হৈয়ে
টাকাটি ভাঙাইয়া—হৈয়ে
রাখাল ভাইরে জানাইয়া—হৈয়ে
আগের ঠাকুর ভাই—হৈয়ে

পিছের ঠাকুর ভাই—হৈয়ে
যে থুইয়া দিবে নারে—হৈয়ে
বাদশার দোহাই—হৈয়ে
বাদশার দোহাই নারে—হৈয়ে
সর্ব লোকে মানে—হৈয়ে
পানির তলে বনের বাঘ—হৈয়ে
তারে খাইল নায়ে—হৈয়ে।

এই ধরনের সুরময় নিরর্থক ছড়া একের পর এক শুনতাম সারা মাস। ওরা ছড়া শোনানোর বদলে কিছু পয়সা ও চাল ভিক্ষে নিত। সব দল সেই পয়সা ও চাল একসঙ্গে জমিয়ে পৌষ সংক্রান্তির দিন ত্রিনাথের পূজা এবং খাওয়াদাওয়া করত মাঠে। জানি না কেন, সেদিন ভোরে কলার পাচন দিয়ে পেটাতো গরুদের।

সেদিন আমাদের নিজেদের উৎসব ছিল পিঠে খাওয়া। কাকভোরে স্নান করে আগের দিন খড় বাঁশ দিয়ে তৈরি ভেড়াভেড়ির ছোট্ট ঘর জ্বালাতাম। সেই পোড়া ঘরের আগুনে শরীর গরম করে চলে যেতাম সোজা রান্না ঘরে। সেখানে ছোলার পিঠে, সুজির পিঠে পুলি পিঠে পাটিসাপটা ও কমলা লেবু খাওয়ার ধুম।

আর একটি খাবার জনপ্রিয় ছিল সে সময়। তার নাম চোঙা-পিঠে। বাঁশির আকারের সরু ও নরম ডলু বাঁশের ভিতর আঠা আঠা বিরনি ধানের চাল ও জল পুরে আগুনে পোড়ানো হল। তারপর নরম বাঁশ ভেঙে বের করা হল সেদ্ধ বিরনি চাল। তখন তারও আকার বাঁশের চোঙার মত, তাই নাম চোঙা-পিঠে। সেই পিঠে খেতে হয় ক্ষীর কিংবা করকরে কই কাছ ভাজা দিয়ে। তখন তো দোকান থেকে খাবার কেনার রেওয়াজ ছিল না। চপ কাটলেট কেউ কিনে খেয়েছে ভাবা যেত না। শিলচর বা করিমগঞ্জে গেলে কদাচিৎ কেউ রসগোল্লা বা জিলিপি কিনে খেত। তা ছাড়া সব খাবার দাবার তৈরি হত বাড়িতেই। পিঠে তৈরির দিন শীতের চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে উনুনের পাশে লোভী চোখ নিয়ে বসে থাকতাম আর দেখতাম দিদিমা কী ভাবে সামান্য ময়দার লেই

উপাদেয় খাদ্যবস্তুতে পরিণত করে ফেলছেন। তারপর গরম গরম হাতে পড়তেই চেটে চেটে পাওয়া। সেই চাটা চলত অনেকক্ষণ—পাছে শেষ হয়ে যায়। দিদিমা এক সঙ্গে বেশি খেতে দিতেন না। তবে দিদিমা যে—নাতিকে বেশি ভালবাসতেন, তাকে লুকিয়ে বেশি পিঠে দিতেন। শীতের সময় আমার একটি বাসি খাবার প্রিয় ছিল। লাউ আর মাছের মাথার ঘণ্ট। আগের রাত্রে রান্না করে রাখা। পরদিন সকালে দেখা গেল তরকারির উপরে সর পড়েছে। গরম ভাতের সঙ্গে ওই তরকারি কী উপাদেয়ই না লাগত। দিদিমা এই তরকারিটা রান্নাও করতেন দারুন।

মামাবাড়ির আর্থিক স্বচ্ছলতা এককালে ছিল খুব। অবস্থাটা পড়তি হতেই লোকজনের যাওয়া আসা কমে গেল, উৎসব অনুষ্ঠানও হল নামমাত্র। আমার তিন মাসী। তার মধ্যে মেজ মাসীর বাড়ির লোকেরা ছিলেন খুব আমুদে আর খাইয়ে। তাদের কেউ এলে বাড়ি জমে উঠত। ওরা কারও বকুনিকে কেয়ার করত না। একবার মা এসেছেন দিন দুয়েকের জন্যে। মেজ মাসিমার ছেলে হরিদাসদাও আছেন। আর কোন একটা ছুটিতে এসেছেন ঠাকুরমামি আর কান্তি তুষার ইলা। হরিদাসদা এসেই বললেন 'এবার প্ল্যানচেট নয়, মিডিয়াম। হরিদাসদা প্ল্যানচেট-বিশারদ। যখন তখন যে কোন আত্মা আনতে পারতেন। কিন্তু মিডিয়াম? সেটা আবার কী? হরিদাসদা বলেন, 'খুব সোজা। অন্ধকার ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে তিন চার জন এক ছোট টেবিলে আঙুল ছুঁইয়ে বসে থাকব। মনে মনে চিন্তা করব কোন পরিচিতের মুখ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই তিন চার জনের উপর আত্মা ভর করবেন। সেই হবে মিডিয়াম। তখন তাকে যা জিজ্ঞাসা করব, সম্মোহিত আস্থায় সব জবাব দেবে।'

সেই রাত্রেই বসল মিডিয়ামের আসর। অনেক ছাঁটাই বাছাইয়ের পর ঠিক হল হরিদাসদা ঠাকুরমামি আর আমি—এই তিন দুঃসাহসী মিডিয়াম-রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হব। কার আত্মা আনা হবে, তাই নিয়ে আর এক দফা তর্ক বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ভোটে ঠিক হল মা'র কাকা অর্থাৎ আমার ছোট দাদামশায়ের আত্মা আনা হবে। প্রস্তাবটি দিলেন

আমার আর এক মাসতুতো দাদা—মণিদা। অঘ্রান মাসের রাত। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। ঘরের ভিতর লণ্ঠনের মিটমিটে আলো সেই অন্ধকারকে আরো রহস্যময় করে তোলে। পাশের বড়ঘরে অপেক্ষা করছেন মা দিদিমা দিদিমণি আর মামাতো ভাই-বোনেরা। দাদামশাই ও মামারা বাড়ি নেই। লীডার হরিদাসদার পেছন পেছন আমরা ছুরুছুরু বক্ষে বসলাম ছোট্ট ঘরে। মাঝখানে নিচু টেবিল আর টেবিল ঘিরে তিনখানা চেয়ার। যাঁর আত্মা আনা হবে, সেই ছোট দাদামশায়ের ফটো ঘরের দেয়ালে। ঘরে ঢুকতেই নজর গেল ফটোটার দিকে। মনে হল, তাঁর চোখ ছুটো আমার দিকে কটমট তাকিয়ে আছে। বুকটা ধক্ করে উঠল, ওই শীতের রাতে তৃষ্ণা পেল।

টেবিলে হাত লাগিয়ে বসতে না বসতেই হরিদাসদা ফুঁ দিয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিলেন। সর্বনাশ! মনে হল আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। কালো কালিতে ঘর বাড়ি সব মুছে গিয়ে আমি এক অলৌকিক জগতে পৌঁছে গেছি। আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আত্মার দল। সবাই একদৃষ্টে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ভয়ে গা ছমছম। গলা শুকিয়ে কাঠ। ভাবলাম চিৎকার করি, পালিয়ে যাই। পারলাম না। আর যাবই বা কী করে? যাঁর আত্মা আনার কথা, সেই ছোট দাদামশাইয়ের ফটোটা যেন আমাকে ছুচোখ দিয়ে গিলছে আর শাসাচ্ছে—'সাবধান এক পা নড়োনা।' ভয়ের পাথর বুকে বেঁধে নিশ্চল ঐ পাথরের মতোই টেবিলে আঙুল ছুঁইয়ে বসে রইলাম।

হরিদাসদার নির্দেশ মত আমাদের তিন জনেরই ছোট দাদামশাইয়ের মুখ চিন্তা করবার কথা। একাগ্রতা বেশি হলেই কোন একজনের মধ্যে তিনি এসে পড়বেন। আমি ঠিক করে নিলাম, ঐ মুখ ভাবব না, মনের কোণে আনব না। ভয় হল যদি তিনি শেষ পর্যন্ত আমার উপর ভর করেন? কাজ নেই ঐ মুখের চিন্তায়।

কিন্তু কী বিপদ? আমি ছাড়লে কী হবে, 'কমলি' আমাকে ছাড়ল না। যতই ঐ মুখ চোখের সামনে থেকে দূর করে দিতে চাই, ততই মনে

হয় সেই মুখ, সেই একদৃষ্টে চেয়ে থাকা মুখ আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে আছে। কিছুতেই সরানো যায় না। অন্ধকার ঘরের ভিতরে শুধু উজ্জ্বল ছুটি চোখ। ভয়ে, শংকায় আরও প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল।

এমন সময় হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ কানের কাছে 'দৈববাণী'। এ কার কণ্ঠস্বর ? আমার সম্বিত ফিরে এল।

আমার গলাটা কাশির রোগীর মত ঘড়্ ঘড়্ করে উঠলো। মাথাটা কাৎ হয়ে এলিয়ে পড়ল চেয়ারের হাতলে। সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাসদার ভয়ব্যাকুল চাপা চিৎকার—'হয়ে গেছে হয়ে গেছে, দিদিমা ছোট মাসিমা বাতি নিয়ে চলে আসুন।'

মা দিদিমারা এসে দেখেন, আমার চোখ বোঁজা, মুখটা একটু বিকৃত, সারা শরীরে ছাড়া ছাড়া ভাব। মামাতো ভাইবোন কান্তি তুষার ইলা —কৌতূহলী হয়ে আমার কাছে আসতেই হরিদাসদা শাসনের সুরে বললেন—'আঃ, তোরা কাছে আসিস না। অমিত এখন তোদের সেজদা নেই, ছোট ঠাকুরদা হয়ে গেছে। ভয়ে মার চোখ ছলছল। হরিদাসদা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন - 'এবার আপনাদের যা প্রশ্ন আছে জিগ্যেস করে নিন্। দিদিমা, আপনিই আপনার দেওরকে প্রথম প্রশ্ন করুন।' সোনা মামার তখনও বিয়ে হয় নি। তাতে দিদিমার ভয়ানক ছুশ্চিন্তা। তিনি তাই প্রথম প্রশ্ন করলেন—'বনোর বিয়ে কবে হবে ?' আমি আর এক প্রস্থ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভাঙা ভাঙা আধো আধো কণ্ঠস্বরে বললাম—'কখনোও হবে না। আশা নেই।'

দিদিমা দমে গেলেন। সাক্ষাৎ আত্মার আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস করার উপায়ও নেই। এবার তিনি একটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন—'আমি আর ক'দিন বাঁচব ? আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম—'ছ' মাস'। দিদিমা আরও দমে গেলেন, মা ও ঠাকুরমামীর মুখে শংকার ঘন পোঁচ। দিদিমার মুখেও। দিদিমা হয়ত ভেবেছিলেন, আত্মা বলবে, তিনি বাঁচবেন আরও বহু বছর। যাই হোক মুখে অবশ্য বললেন—'যাক্ বাবা, মরে বাঁচা যাবে। সংসারের যা হাড়ভাঙা খাটুনি, আর পারি না।' লক্ষ্য

করলাম দিদিমার গলা কাঁপা কাঁপা।

দিদিমা আর কোন প্রশ্ন করার সাহস পেলেন না। ফাঁক বুঝে মামাতো বোন ইলা ছম করে জিগ্যেস্ করে বসল—'আমি ক্লাস ফাইভের পরীক্ষায় পাশ করব কি?' 'অসম্ভব'—আমার আবার নির্লিপ্ত কণ্ঠ।

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। উত্তেজনার চোটে এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করে নি। মিডিয়ামে আসা আত্মার বিধবা স্ত্রী,—আমাদের দিদিমণি এক কোণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। স্বামীশোক উথলে উথলে উঠছে। হঠাৎ আমার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। আমার পা ছুঁতে যেতেই হরিদাসদার চিৎকার—'আহা-হা, হাত দেবেন না আত্মা চটে যাবে। বরং প্রশ্ন করুন।

দিদিমণি অগত্যা কান্নাভরা গলায় সলজ্জ ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন—'আপনি এখন কোথায় আছেন?'

'কাশীতে'—আত্মার উত্তর।

'আমাকে কবে আপনার কাছে নিয়ে যাবেন?' দিদিমণির প্রশ্ন।

'অনেক দেরি'—আত্মার উত্তর। দিদিমণি শেষমেষ জিগগেস করে বসলেন—'আমার কথা আপনার মনে পড়ে?'

'মোটেই না, এখন একা একা খাসা আছি।' দিদিমণি আর বেশী ঘাঁটাঘাটি না করে ফোঁপানো কান্নার দিকেই বেশি মনোযোগ দিলেন।

তারপর নানা প্রশ্ন চলছে। আত্মা আমার মারফৎ চট্‌পট্ জবাবও দিয়ে যাচ্ছে। এদিকে মা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার গোঁ গোঁ চিৎকার আর দাঁতমুখ খিঁচুনি দেখে তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। মৃত কাকার চেয়ে জ্যান্ত ছেলে বড়। অনুনয়ের সুরে বললেন—'হরিদাস, এবার থামা।' হরিদাসদা নিস্পৃহকণ্ঠে বললেন—'নিজে না থামলে আমি কী করব।'

মা আর কোন কথা না বলে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন আমার চোখে মুখে। শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা। বাপরে! আমি 'উফ্' বলে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। তারপর আবার গোঁ গোঁ

চিৎকার আর দাঁত মুখ খিঁচুনির পুনরাবৃত্তি করে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালাম। দেখি, সবার নজর আমার দিকে। ধরা ধরা গলায় অসুস্থ রোগীর মত বললাম—'আমি কোথায় ?' মা কোন কথা না বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে সোজা বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

মা'র ইচ্ছে ছিল আমাকে ওর পাশে নিয়ে যান। হরিদাসদা বললেন—'কিচ্ছু ভেবো না মাসীমণি, ও আজ আমার সঙ্গেই শোবে।'

সবাই চলে গেলে এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি আর হরিদাসদা দু'জনেই প্রাণ খুলে এক চোট হেসে নিলাম। হরিদাসদা বললেন—'আমার ইশারা বুঝতে পেরেছিলি ?'

'পারব না কেন ? প্রথমে অবশ্য ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর কানে কানে যেই তুমি বললে 'এবারে তুই হয়ে যা' তখনই বুঝলাম আমাকে মিডিয়াম হতে বলছ। ব্যস, তারপর এক নাগাড়ে অভিনয় করে গেলাম।'

"চমৎকার করেছিস।"

"কিন্তু ঠাকুরমামী ইশারা টের পান নি তো ?"

"আরে দূর দূর, উনি তখন ছোট দাদামশাইয়ের চিন্তায় মগ্ন।"

পরদিন ঘুম ভাঙার পর মহাফ্যাসাদ। কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, মুখ টিপে টিপে হাসে। শুনতে পাই, মা অন্যদের বলছেন 'ওর সামনে কিন্তু কেউ কাল রাতের ঘটনা বলো না।' আরও মজার ব্যাপার, দিদিমণি আমাকে দেখে ঘোমটা টানেন।

মাস তিন পর দিদিমার সত্যি সত্যি বসন্ত হয়ে গেল। মরণাপন্ন অবস্থা। দিদিমার বদ্ধমূল ধারণা হল তিনি এবার মারা যাবেনই। কারণ মিডিয়াম মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। আমিও কাকতালীয় ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেলাম। জনে জনে গিয়ে বলতে লাগলাম, 'সেদিন আমি অভিনয় করেছিলাম।' কিন্তু হায়রে কপাল, কেউ আমার কথা বিশ্বেস করে না। ওঁরা বলেন, যা, যা আর ধাপ্পা দিতে হবে না। মা দিদিমাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছিলেন। তাকে সব কথা বললাম। তিনিও আমার কথা অবিশ্বাস করেন, বলেন, 'কীযে বলিস।'

কী আর করি, হাল ছেড়ে দিলাম। দিদিমা সুস্থ হওয়ার পর সবাইকে ডেকে বললাম, "দেখলেতো, মিডিয়ামের কথা সত্যি হয়নি।" ঠাকুরমামি ভাঙেন তো মচকান না, বলেন "চেহারা যা হয়েছে তা মৃত্যুরই সামিল।"

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ইলা ক্লাস ফাইভের পরীক্ষায় ফেল করল। সবাই আবার মিডিয়ামের প্রসঙ্গ তুলল। কিন্তু সোনা-মামার বিয়ের পর কিন্তু মিডিয়ামের কথা কেউ পাড়ল না, অলৌকিকের প্রতি এমনই বিশ্বাসপ্রবণতা।

দিন যায়। বছর যায়। অন্তর্মুখী আমি একটু একটু করে বহির্মুখী হই। সেদিনের মিডিয়ামী অভিনয় আমাকে যেন একটু বাচালও করে দিল, মুখচোরা কথা বলতে শুরু করল। হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলাম সে সময়। ঠিকানা জোগাড় করে প্রমথেশ বড়ুয়াকে এক চিঠি লিখে বসলাম। সেই চিঠির জবাবও এল। আমি আনন্দে আত্মহারা। মনটা ক্রমেই পৌঁছতে লাগল কলকাতার কাছাকাছি। সুরমা মেলে শিলচর থেকে সোজা জগন্নাথ ঘাট। স্টিমারে যমুনা পেরিয়ে সিরাজগঞ্জ। কিংবা সোজা চাঁদপুর। স্টিমারে পদ্মা পেরিয়ে গোয়ালন্দ। তারপর চুয়াডাঙা রানাঘাট নৈহাটি, দমদম শিয়ালদা। সেখানে রেলগাড়ি উঁচুচালের বাড়ির ভিতর থামে।

ইতিমধ্যে উঠেছি ক্লাস টেনে। গ্রাহক হয়েছি পাঠশালা পত্রিকার। নরেন্দ্র দেব সম্পাদক। নরেনদা কী যত্ন করেই না মফঃস্বলের অকাল-পক্কদের লেখা ছাপাতেন। পাঠশালা মারফৎ চিঠিতে আলাপ হল পরবর্তীকালে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপ দে চৌধুরীর সঙ্গে। আর আলাপ হল সত্যব্রত বসু কিরণকুমার রায় ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনসর্মা আর আমার সমনামী নেত্রকোণার অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে। এবং কী আশ্চর্য একদিন আমার একটা হাসির কবিতাও ছাপা হয়ে গেল পাঠশালায়। ধাঁধার উত্তরে নয়, আস্ত একখানা ছাপা কবিতার নিচে ছাপার অক্ষরে আমার নিজের নাম। 'আমাদের আসামে' আগে আমার যে কবিতা ছাপা হয়েছিল, তা যুদ্ধের প্রচারের কাগজ। কিন্তু পাঠশালা কলকাতার

পত্রিকা। পোস্ট অফিসে যেদিন পাঠশালা এল, তুমুম কাণ্ড হয়ে গেল গ্রামে। 'দেখি দেখি' বলে পত্রিকা নিয়ে কাড়াকাড়ি। বিপুলেশ নাগের পর এই প্রথম অন্তরা আমায় একটু গুরুত্ব ছিল। পত্রিকার ওই বিশেষ পৃষ্ঠাকে লুকিয়ে কতভাবে যে রোজ দেখি। মনে মনে ভাবি তাহলে এতক্ষণে কলকাতার জ্ঞানীগুণীরা আমার নাম জেনে গেছেন? তাহলে আমি আর তাদের অপরিচিত নই। আমার ছোটকাকা কলকাতায় থাকতেন। তিনি বড়থলে এসে কলকাতার গল্প বলতেন। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। সেই কলকাতা আমাকে ডাক দিল নতুন করে।

কিন্তু এদিকে 'প্রবাসী' হঠাৎ আমাকে একটু অন্যদিকে টেনে নিল। প্রবাসীতে শান্তিনিকেতনের অনেক ছবি দেখতাম, আর রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা পড়তাম। প্রবাসীর ছবি গোপনে কেটে আমার মহামূল্যবান চিত্র-চয়নিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ভরিয়ে ফেলেছি। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, রবীন্দ্রনাথ মারা যান। আমার বাবা ররাবর রবীন্দ্রানুরাগী। রবীন্দ্রভক্তি বাড়ল ১৩৪৮ সালের বাইশে শ্রাবণের পর। কলকাতা শান্তিনিকেতন কত কাছাকাছি স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তবে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসু ক্ষিতিমোহন সেনের শান্তিনিকেতনে যদি ভর্তি হই, তাহলে কলকাতারও রূপ রস গন্ধ পাব বলে ধরে নিলাম। কাউকে কিছু না বলে মনে মনে আমি প্রস্তুত হলাম। শিলচরের কলেজে পড়ব না। হয় শান্তিনিকেতন, নয় কলকাতা। তবে শান্তিনিকেতনই তো কলকাতা। তখন কি আর ছাই জানি, ওই দুই জায়গার ভৌগোলিক দূরত্ব যতটা, তারচেয়ে বেশি মানসিক দূরত্ব!

ওদিকে মামাবাড়ির অবস্থা আরো কাহিল। ঠাকুরঘরের দালানে আরো জমেছে শ্যাওলা, ফুলের বাগান নেই বললেই চলে, কামরাঙা বাতাবী গোলাপজাম যে যখন পারে চুরি করে নিয়ে যায়। গোটা বাড়িটাকে ভুতুড়ে বলে মনে হয়। বিরাট এলাকা, তার মধ্যে লোক আছে কি নেই বোঝা যায় না। দক্ষিণের হিস্যায় আমি সমীরদা, কান্তি ও দিদিমা। উত্তরের হিস্যায় দিদিমণি আর সুন্দরমামা সুন্দরমামী।

সুন্দরমামা রেলে কাজ করেন। কদাচিৎ বাড়ি থাকেন। তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন কান্তিকে নিয়ে ঠাকুরমামার কাছে চলে গেলেন দিদিমা। পড়ে রইলাম আমি আর সমীরদা। দাদামশাই তো সেই পাঁচগ্রামে। রান্না বান্না, বাড়ি সাফ করা, গরুর তদারকি কর—সবই আমাদের দায়। এমন কি ধানের হিসাবও রাখতে হত আমাদের। সমীরদা কর্তা, আমি জোগানদার।

এখন ভাবি, আমার সেই উঠতি বয়সে মা-বাবা এত জেনেশুনে এত নির্লিপ্ত ছিলেন কী করে? ওই বিরাট বাড়িতে যে-কেউ খুন করে যেতে পারত, কুসঙ্গদোষে উচ্ছন্নে যেতে পারতাম, পড়াশোনা লাটে উঠতে পারত। এই বিশ্রী অবস্থার খারাপ দিকটা বড়থলের বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের কেউই তলিয়ে দেখেন নি! মামাবাড়িতে আছি, ওটাই যেন পরম নির্ভয়ের ব্যাপার। আমি বা সমীরদা যে বখে যাইনি, তার জন্যে কৃতিত্ব আমাদের স্বভাবের। আমার কেবল মনে হত, ঠাকুরদা বেঁচে থাকলে, এমনটি হতে দিতেন না। তিনি মারা যান ১৯৪২ সালের গোড়ায়।

সেই যাই হোক, বিরাট বাড়িতে থাকি। নিজেরাই সম্রাট। তারই ফাঁকে পড়াশোনা চলে। কিছুদিন পরে কান্তিকে নিয়ে দিদিমা আবার আসেন, আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে শ্রীগৌরী ছাড়ার দিন। কিন্তু এই নদী, এই পথঘাট, এই বন্ধুবান্ধব, এই আত্মীয় স্বজন কাউকেই আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি নি। তবে স্নেহ ভালবাসাও তো পেয়েছি। আদর পেয়েছি। কান্তি ছাড়া কারো সঙ্গে মনের মিল হয় নি বলে মনে মনে কষ্ট পেয়েছি, এই যা। আর তাছাড়া ওইভাবে মা যদি আমাকে মনের জোর দেখিয়ে মামাবাড়ি না পাঠাতেন, তাহলে আমার পড়াশোনা এত সহজ গতিতে এগোত না। যত কষ্টই হোক, প্রতি বছর এক এক ক্লাস ডিঙিয়ে ম্যাট্রিক তো পাস করেছি। নইলে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হতাম কী করে, কলকাতায় চাকরি করতাম কী করে? মা'র জন্যেই আমি এম এ পর্যন্ত পড়তে পেরেছি। তবে বাবা ছোটবেলায়

আমার লেখাপড়া সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকলেও পরে ছিলেন না।

ওদিকে আমি যেমন একটু একটু করে করে পাল্টাচ্ছি, চারপাশের চেহারাও তেমনি পালটাচ্ছে। আমার গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়েছে, চুল কদমছাঁট নয়, উলটে আঁচড়াবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, সামনে কোঁচা না ঝুলিয়ে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরি মাঝেসাঝে, সাঁতার শিখেছি. হাফপ্যাডল করে করে সাইকেল চড়তে পারি মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খবর রাখি, রবীন্দ্র বঙ্কিম শরৎ ছেড়ে তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ গোগ্রাসে গিলছি, জেনারেল নলেজের বই পড়ে পড়ে মনে মনে নিজেকে সিলেট চ্যাম্পিয়ান ঘোষণা করে বসে আছি এবং আমি যে আমার বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের থেকে আলাদা, এই অহমিকাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

দেশের অবস্থাও অন্য রকম। ১৯৩৯ সালে যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগে। স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে তর্ক করি হিটলার বড়, না শ্রীকৃষ্ণ বড়। ইংরেজ হারুক মনে মনে চাইতাম। কিন্তু অ্যারেস্ট হবার ভয়ে বাইরে বলতে পারতাম না। এল বিয়াল্লিশের আন্দোলন. স্কুলে স্ট্রাইক। স্ট্রাইকে যোগ দিয়ে দেশকে আরো ভালবাসতে শিখলাম। সেই সঙ্গে দেখলাম কাঁচা পয়সা মানুষকে কত বিভ্রান্ত করতে পারে। কাছাড় জেলা মনিপুরের সঙ্গে আমার লাগোয়া। তখন তৈরি হচ্ছে স্টিলিওয়েল রোড, কুম্ভিরগ্রামে শমসের নগর সিঙ্গারবিলে এয়ারপোর্ট ঠিকাদারে ঠিকাদারে ছেয়ে গেছে সারা দেশ। কাঁচা টাকার ঝনঝন দোকানে বাজারে। ইতিমধ্যে জাপানিরা এসে গেল ঘরের কাছে। বোমা পড়ল কুম্ভিরগ্রামে এবং ডাপি চা বাগানে। দেখা দিল মজুতদারি কালোবাজারি। এক বিশ্রী অবস্থা। মানুষের সুখের জীবন ছিনিয়ে নিয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। আমি তখন সাবালক। বকুনি বিশেষ খাইনা। দিদিমাতো আছেনই. ঠাকুরমমা সোনামামারা সবাই আবার পাকাপাকিভাবে ফিরে এসেছেন বাড়িতে। দাদামশাই পাঁচগ্রাম থেকে ঘন ঘন আসেন। আবার বাড়িতে লোকজন হাঁকডাক। বেশি করে

স্নেহ ভালোবাসার পরিচয় পাই। কিন্তু আমি বিদায়ী পথিক। ফাইন্যাল পরীক্ষা দিলেই শ্রীগৌরী আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সেণ্টার পড়েছিল করিমগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে। পরীক্ষা দিতে গিয়ে উঠেছিলাম আমাদের আত্মীয় আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী কামিনীকুমার সেনের বাড়িতে। ১৯৩৬ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে এসেও ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম।

পরীক্ষার পর আবার শ্রীগৌরী চলে যাব জেনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল কান্তি—আমার ভাই, আমার শিষ্য আমার বন্ধু। কিন্তু আমার মন তখন অনেক দূরে।

সবাইকে প্রণাম করে একদিন সত্যি সত্যি বিদায় নিলাম। তার পর বড়থলে বসে পরীক্ষার ফলের অপেক্ষা করি। আমার তখনও অদেখা বন্ধু দিলীপ দে চৌধুরীই কলকাতা থেকে জানাল আমি পাশ করেছি। মায়ের মুখে হাসি, ঠাকুরমার মুখে হাসি। বাবাও খুশি।

শান্তিনিকেতনে ভর্তি হওয়ার কথা বাবাকে বললাম। রাজি। কিন্তু মাসে ৪০ টাকা কে দেবে? ভরসা দিলেন বড়কাকাবাবু। সেই ভরসাতেই ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে আমি নাগাল পেলাম আমার স্বপ্নের সুরমা মেলের। শিলচর স্টেশনে কলকাতার টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়লাম আমি, সঙ্গে মা ও বাবা। শ্রীগৌরী ছাড়িয়ে রূপসীবাড়ি ছাড়িয়ে এতদিন পর আমি স্বস্থানে ফিরছি।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শিলচর থেকে বদরপুর জংশন। পরের স্টেশন রূপসীবাড়ী। সুরমা মেল দাঁড়ায় না। দিদিমা দাদামশাই মামা মামীদের জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। ওরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই তো আজ কলকাতা রওনা হতে পেরেছি। ধমকের সঙ্গে স্নেহও তো পেয়েছি। ট্রেন ছুটে চলেছে। সেই হুইসিলের আওয়াজ, সেই চোখ ঝলসানো কামরা।

সন্ধ্যায় আবছা আলোয় যেন মনে হল রেললাইনের বেড়ার তারে গা এলিয়ে দিয়ে খালি গা, বিষণ্ণ মুখ অল্প বয়সী একটি ছেলে অবাক বিস্ময়ে সুরমা মেলের ছুটে চলা দেখছে। তার মুখটা বড় চেনা।